নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অজানা চিঠি

লীলা মজুমদারের আশ্চর্য গল্প আঁ কি বুঁ কি

বসন্ত ২০০৬ । ১০ টাকা

সন্দেশ

লীলা মজুমদার

সম্পাদক

সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১০-১১। মাঘ-ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৬

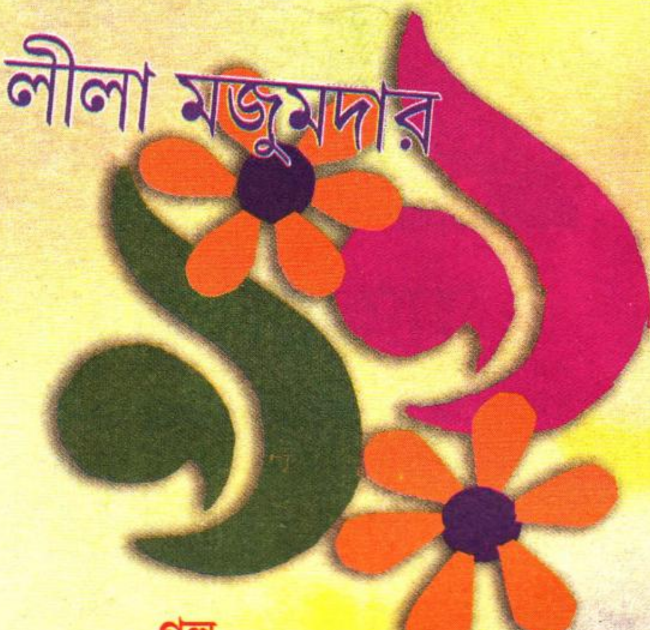

বিশেষ রচনা

সুভাষচন্দ্র বসু • শোভন সোম
কলকাতার পার্ক ৬
শঙ্খ ঘোষ অল্পবয়স কল্পবয়স ২৪
নবনীতা দেব সেন হিং টিং ছট ৩৬
ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মঙ্গলের জীবের পৃথিবী অভিযান ৫৯
সুনীত সেনগুপ্ত জটায়ু জিন্দাবাদ! ৭০

ধারাবাহিক উপন্যাস

শৈলেন ঘোষ ঝুংরিটুং ১৬
বুদ্ধদেব গুহ ফোটা কার্তুজের গন্ধ ৮৬

গল্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফুরুজানি আর দেমাজানা ২৮
লীলা মজুমদার আঁকিবুঁকি ৫০
রাজশ্রী রাহা কুট্টি ৯৩

ছড়া ও কবিতা

জয়নাল আবেদিন একুশ এলেই ২১
দীপ মুখোপাধ্যায় এট্টুকু ছেলে ২৭
রঞ্জন প্রসাদ ক্রসিং ৪০
মৃদুল দাশগুপ্ত একদিন স্কুলে ৯৮

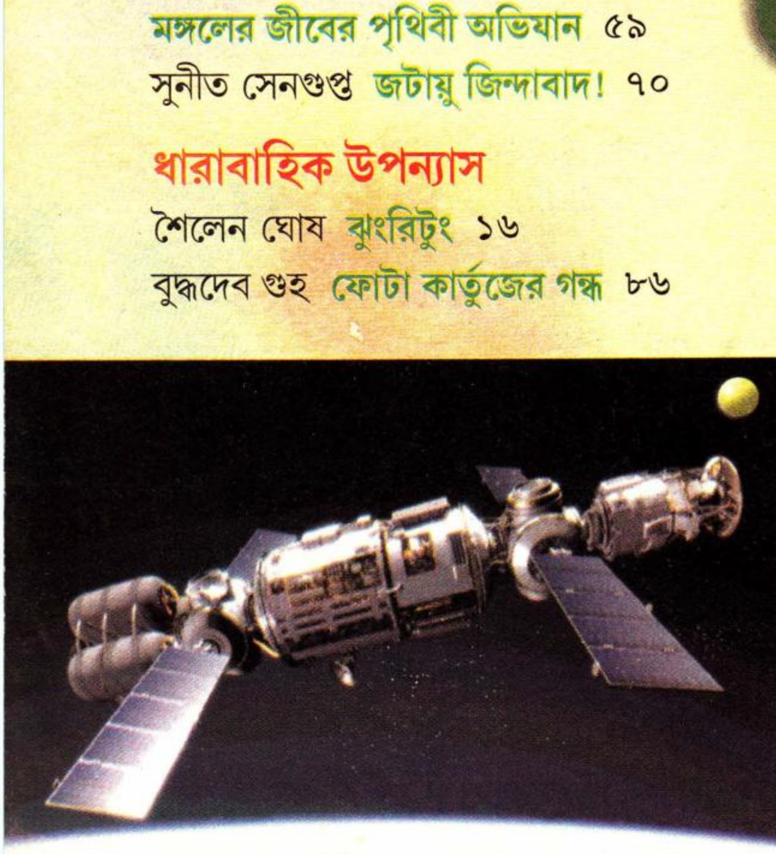

কার্টুন ও কমিক্স

চণ্ডী লাহিড়ি জলহস্তী স্থলহস্তী ২২

অমল চক্রবর্তী ছবির মজা ৪৯

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ধনুক-ছিলার ঠেলা! ৯৬

বিভাগীয় রচনা

চিঠিপত্র ৯

রাজশ্রী রাহা রান্নাবান্না ৩৯

উজ্জ্বল চক্রবর্তী কী দেখবে, কী শুনবে ৪২

সব্যসাচী চক্রবর্তী প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ৬৫

পত্রবন্ধু হতে চাই ৭৭

হাত পাকাবার আসর ৭৮

রেবন্ত গোস্বামী শব্দ-জব্দ ৮১

অনিরুদ্ধ দেব মনের কথা কই ৯২

প্রচ্ছদপট

সমীর সরকার

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ

জয়নুল আবেদিন
সত্যজিৎ রায়
সমীর সরকার
চণ্ডী লাহিড়ি • অমল চক্রবর্তী
নীতীশ মুখোপাধ্যায়
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
দেবব্রত ঘোষ • সমীর দাশ
কৃষ্ণেন্দু চাকী • দেবাশিস দেব
পার্থসারথি ভট্টাচার্য • সৌমিত্র সোম
সন্দীপ রায়

প্রতিকৃতি

দেবব্রত ঘোষ

আলোকচিত্র

সুকুমার রায়
সব্যসাচী চক্রবর্তী • গৌরব চক্রবর্তী

শিল্প নির্দেশনা

সুজয় সোম

অঙ্গসাজ

সুমন চৌধুরী
শুভ্র রায় • কৌশিক ঘোষ

স ম্পা দ ক সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

সন্দেশ কার্যালয় ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড কলকাতা ৭০০০২০ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৫২ রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

ফোন • সম্পাদকীয় ৯৪৩৩৩৬৭৩৯৩। মার্কেটিং ৯৩৩৯৭৭২২৮৫। বিজ্ঞাপন ৯৮৩০৬৮৮০১৭
ফ্যাক্স (৯১) (০৩৩) ২২২৬২৭২৮ ই-মেল sandesh1913@yahoo.co.in

সুভাষচন্দ্র বসু

কলকাতার পার্ক

১

কর্পোরেশন অব ক্যালকাটা
মিউনিসিপাল অফিস
৩০ মে ১৯২৪

প্রিয় বিলি,

এলেনবি রোডের পার্কের ব্যাপারে আমি খোঁজ নিয়েছি এবং জেনেছি যে, ওই পার্কটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের। যতদিন-না ওটা আমাদের (কর্পোরেশনের) হাতে আসে, সংশয় নিয়ে বলছি, এ-ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারব না।

তোমারই স্নেহের
সুভাষ

সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস
২৩ আগস্ট

প্রিয় বিলি,

তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরি হওয়ায় মাফ কোরো। আমাদের পার্কগুলোতে ক্রিকেট খেলতে দেওয়া যাবে না, তবে ফুটবল খেলতে দেওয়া যেতে পারে। বহু ক্লাব ফুটবল খেলতে চায়, এবং (কর্পোরেশনের) ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বিভিন্ন ক্লাবের জন্য তারিখ বরাদ্দ করবে। এখন কিছু লিগ ম্যাচ চলছে। আমার মনে হয়, যতদিন-না ম্যাচ শেষ হয়, ততদিনের জন্যে ওরা সপ্তাহে চারদিন (পার্কে) খেলার অনুমতি নিয়েছে। তুমি যদি (পার্কে) ফুটবল খেলতে চাও, তাহলে তোমার ক্লাবের হয়ে দরখাস্ত কোরো। খেলার মাঠ চেয়ে এত বেশি দরখাস্ত পড়েছে যে, তুমি নিজের জন্যে মাঠ পাবে না বলে আমি দুঃখিত।

তোমারই স্নেহের

সুভাষ

কলকাতার পার্কগুলোতে শিশুরা খেলবে, বয়স্ক মানুষেরা হাওয়া খাবেন, না রাজনৈতিক সভা হবে, মেলা বসবে—এ-নিয়ে হামেশা নানা তর্ক ওঠে। স্বাধীনতার আগে বড় বড় রাজনৈতিক সভা হত উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে, কখনও দক্ষিণের দেশপ্রিয় পার্কে, এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সি কলেজ আর বইপাড়ার খুব কাছেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। চৌরঙ্গি তখন বাঙালি বা দিশিপাড়া ছিল না। তাই ময়দানে বাঙালিদের জমায়েতও সম্ভব ছিল না। তবে পার্কে মেলা হবে না খেলা হবে, বাচ্চারা খেলবে বা দাদু-দিদারা বেড়াবেন, এমন তর্ক বেশ পুরনো। হালে যখন নতুন করে এ-নিয়ে তর্ক উঠেছে, তখন একটু পেছন ফিরে তাকানো যেতে পারে।

সেটা ১৯২৪। আজ থেকে ৮২ বছর আগে। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র হয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তাঁর আইনব্যবসা ছেড়ে দেশসেবায় যোগ দিয়েছেন। আইনব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তি ছিল বিপুল। তাঁর দেশসেবায় মুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে 'দেশবন্ধু' নাম দিয়েছে। দেশবন্ধুর বয়স তখন ৫৪। তাঁরই তরুণ শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনি কর্পোরেশনে নিয়োগ করলেন প্রথম চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার হিসেবে। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন ২৭। তিনিও ২৩ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে গিয়ে, মাত্র ছ'-মাস পড়েই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেও, সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন!

কর্পোরেশনের প্রধান অফিসার হিসেবে সুভাষচন্দ্রকে নানা দিক সামলাতে হত। এখনকার মতো তখনও কলকাতার কিছু পার্ক ছিল কর্পোরেশনের আওতায়, কিছু পার্ক ছিল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাতে। বিলি ওরফে রবীন্দ্রনাথ মিত্র হলেন সুভাষের ভগ্নিপতি। খেলায় উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ এলেনবি রোডের পার্কে খেলা যাবে কিনা জানতে চেয়ে সুভাষকে চিঠি লেখেন। তার জবাব সুভাষ দেন ইংরেজিতে, ১৯২৪ সালের ৩০ মে। রবীন্দ্রনাথ মিত্রের আরও একটা চিঠির জবাবে কলকাতার পার্ক নিয়ে সুভাষচন্দ্র আবার চিঠি লেখেন ইংরেজিতেই, আগস্ট মাসের ২৩ তারিখ। দুটো চিঠিরই বাংলা তরজমা করে দিলাম।

সে-সময় ক্রিকেট খেলতেন রাজা-মহারাজারা এবং বড়লোকের ছেলেরা। সাধারণ বাঙালির খেলা ছিল ফুটবল। সম্ভবত বাঙালি ছেলেদের খেলাধুলোয় উৎসাহ দেবার জন্যেই সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার পার্কে ক্রিকেটের বদলে ফুটবল খেলার অনুমতি দিতে আগ্রহী ছিলেন।

চিঠি-দুটোর গুরুত্ব এই কারণে যে, পার্কে খেলা হবে কিনা, এবং কী খেলা হবে, এ-নিয়ে তর্কটা যে বেশ পুরনো, তা এই দুটো ঐতিহাসিক চিঠি থেকে জানা যায়।

শোভন সোম

সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি : দেবব্রত ঘোষ

লীলাদি ৯৯, 'সন্দেশী' প্রণাম

শীতকাল ফুরিয়ে গিয়ে যেই-না বসন্তের বাতাস বইছে, ওই তো—কী দারুণ একটা রোববার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬। লীলাদি, তোমাদের প্রিয় সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের ৯৯তম জন্মদিন, ৯৮ বছর পূর্ণ। তার মানে, এক বছর বাদেই শুরু হবে জন্মশতবর্ষের উৎসব!

উত্তর কলকাতায় ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে লীলাদির জন্ম, ১৯০৮ সালে। ওই বাড়িতেই 'সন্দেশ'-এর জন্ম। ওই ঠিকানাটাই 'সন্দেশ'-এর প্রথম ঠিকানা। ১৯১৩ সালের পয়লা বৈশাখ সন্ধেবেলা একতলার ছাপাখানা থেকে 'সন্দেশ'-এর জ্যান্ত প্রথম সংখ্যাটা হাতে নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর যখন দোতলায় উঠে এলেন, বাড়িময় খুশি আর আহ্লাদের স্রোত বয়ে গেল—পাঁচ বছর বয়েসে চোখের সামনে দেখা ঝলমলে দিনটাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে গুঁজে দিয়েছেন লীলাদি, কত-না লেখায় রামধনু-রঙে এঁকেছেন 'সন্দেশ'-এর জন্মদিনটা! ৪০ বছর সেই 'সন্দেশ'কে মায়ের মতো বুকে আগলে রেখেছেন লীলাদি। লীলাদির প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল সুকুমার রায়ের 'সন্দেশ'-এর শেষ সংখ্যায়। সেপ্টেম্বর ১৯২৩। একটা মহাদুষ্টু ছেলেকে নিয়ে লেখা গল্পটার নাম 'লক্ষ্মী ছেলে'। তারপর ৭৫ বছর ধরে লীলাদির টইটম্বুর সাহিত্যজীবন—আশ্চর্য জাদুবাস্তবতার হীরকজয়ন্তী! সত্যি রূপকথার সেই লীলাদিকে ক'দিন আগে দেখতে গেসলেন তোমাদের ছোটসম্পাদকমশাই। রাত তখন প্রায় সাড়ে-আট, বাইরের ঘরের সোফায় বসে টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে লীলাদি। বেয়াড়া সময়, তাই খানিক দূর থেকে দেখা, কোনও কথা হয়নি। একটু-যেন রোগা হয়ে গেছেন, মাথার চুল কিছুটা পাতলা। কিন্তু বসে থাকার ভঙ্গিতে, শাড়ি-পরার ঢঙে, ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে টিভি দেখার আলসেমিতে—না, প্রায় ১০০ বছর বয়েসেও লীলাদির টগবগে, মধুর ব্যক্তিত্ব এতটুকু টস্‌কায়নি! কিন্তু কীভাবে লীলা মজুমদার হয়ে উঠলেন বাংলাভাষার চিরকালের সেরা একজন কথাশিল্পী? জীবনের প্রথম বারোটা বছর বন-পাহাড় নদী-ঝরনার মধ্যিখানে, প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছেন বলে?

বলি কী, তোমাদের রোজকার জীবনযাপনে, খেলাধুলো আর পড়াশোনায়, স্বপ্ন এবং দুষ্টুমিতে, সাঁতার কাটা ও টিভি দেখায়, গান-বাজনা থেকে ঘুড়ি ওড়ানো বা কম্পিউটারচর্চায় মিশে যাক লীলাদি-উৎসব। লীলা মজুমদারের গল্প-উপন্যাস পড়ার অফুরন্ত আনন্দে মেতে উঠুক বাংলা-জানা পৃথিবীর সব মানুষ।

'সন্দেশী' প্রণাম, ভালো থেকো লীলুদি!

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

শীতের ভোরের গোলাপি আলোর মতো ঝকঝক করছে নতুন 'সন্দেশ'

একেবারে হঠাৎই নলেনগুড়ের 'সন্দেশ' হাতে পেয়ে বড় তৃপ্ত হলাম। বয়েস আমার ৬০-এর ওপর। ছোটবেলায় যখন মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে আম কুড়োতে যেতাম, সেই বয়েস থেকে 'সন্দেশ' পড়েছি। তারপর আমার মেয়েদের কিনে দিয়েছি। সেদিন হঠাৎ আমার নাতি ঋকের হাতে ডিসেম্বর ২০০৫-এর 'সন্দেশ' দেখে চমকে উঠলাম! হাতে নিয়ে দেখি—শীতের ভোরের গোলাপি আলোর মতো ঝকঝক করছে নতুন 'সন্দেশ'! বুক ভরে গেল! সঙ্গে সঙ্গে বয়েসটাও কমেও গেল অনেকখানি। নাতির সঙ্গে ঝগড়া করে বসে গেলাম নতুন নলেনগুড়ের 'সন্দেশ' নিয়ে!

এই 'সন্দেশ' এখন শুধু ছোটদেরই নয়, আমার মতো লোভী বুড়োদেরও!

সুশীল দাশ
৩ পূর্ব পাড়া রোড এক্সটেনশন
কলকাতা ৭০০০৪৯

সেদিন বইয়ের দোকানে বর্ষা সংখ্যা 'সন্দেশ' দেখে চমকে উঠলাম। একটু নাড়াচাড়া করে কিনেই ফেললাম। শারদীয় সংখ্যার 'চাঁদের হাট!'-এর বিজ্ঞাপন দেখে মন ভরে গেল। ফিরে গেলাম সেই দারুণ কৈশোরে—যখন ঘরে ঘরে টিভি ছিল না, ছিল না ছেলেপুলেদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার এই আজব হিড়িক! বাংলা-মাধ্যমে পড়াশোনার রেওয়াজ ছিল বেশি, আর ছিল সারা বছর ধরেই—বিশেষ করে গরমের ছুটি এবং পুজোর ছুটিতে গল্পের বই আর পত্রিকা পড়ার নেশা। সেই 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার থলে' থেকে শুরু করে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লীলা মজুমদার পেরিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, শঙ্কু, আরও সব গল্প। এবং আমার গোটা ছোটবেলা-জুড়ে ছিল লীলা মজুমদার সত্যজিৎ রায়ের 'সন্দেশ'। এখন তো বেশিরভাগ শহুরে ছেলেমেয়েকে গল্পের বই বা পত্রিকা পড়তে দেখি না, অথবা খুবই কম দেখা যায়। প্রায় সকলেরই বেশি পছন্দের জিনিস ওই বোকা হবার বাক্সটা—টেলিভিশন!

বর্ষা সংখ্যা থেকে আজ পর্যন্ত সবক'টা 'সন্দেশ'-ই পড়েছি। নতুন 'সন্দেশ'-এর বিচিত্র রচনার শৈলীতে এবং আশ্চর্যসুন্দর অলঙ্করণ ও অঙ্গসজ্জার উজ্জ্বলতায় বাঙালি ছেলেমেয়েরা বাংলাভাষা ও বাঙালিজীবনকে ভালোবাসতে শিখুক। কিছু খারাপ লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাভাষা এখন সতীনের সঙ্গে ঘর করছে!

আমাদের ফেলে-আসা মধুর কিশোরবেলা ফিরে আসুক আজকের ছেলেমেয়েদের জীবনে, 'সন্দেশ'-এর মতো সেরা পত্রিকাকে ভালোবেসে।

মঞ্জুলা ভট্টাচার্য
'পূর্বাচল'। এ সি চ্যাটার্জি লেন। চন্দননগর
হুগলি। ৭১২১৩৬

শারদীয় 'সন্দেশ' দেখে ঠিক ছেলেবেলার মতো একসাইটেড হয়ে পড়লাম! পেলাম বইমেলায়। দৈনন্দিন পাপক্ষয়ের মধ্যে চোখ এড়িয়ে গেছিল ২০০৫-এর মে মাসে 'সন্দেশ'-এর নব অভ্যুত্থান! প্রচ্ছদের উড়ন্ত পাখিটা নির্ঘাত ফিনিক্স, তাই না?

ক্লিশে নয়, আন্তরিক ধন্যবাদ, কয়েকটা কথা বিশেষভাবে জানানোর তাগিদ অনুভব করছি।

(ক) এমন কোনও লেখা পেলাম না—যা 'সেরা'র থেকে একচুলও কম!

(খ) রাজেশ বসুর উপন্যাস 'মহাকাশের মৃত্যুদূত' (ধৃষ্টতা মার্জনীয়) শঙ্কুকাহিনির স্মার্টনেস মনে করাচ্ছে। আরও চাই!

(গ) বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় ডানদিকের মার্জিন চওড়া থাকায় 'সন্দেশ'কে অনায়াসে মুড়ে পড়তে পারছি। আর-কোনও শারদ সংখ্যা এ-সুযোগ দেয়নি! প্লাস, পয়েন্টসাইজ বড় হওয়ার ফলে চোখের আরাম—দারুণ!

(ঘ) চিরসবুজ লীলা মজুমদারের উপন্যাস—'রেশালার বাবু'—সুপারলেটিভ লেখা!

(ঙ) ছড়া-কবিতাগুলো বড্ড ভালো। বড় হন্টিং, বার বার পড়ার মতো।

দেবাশিস সরকার
ফ্ল্যাট ডি/৩০, টাইপ ৪। আয়কর আবাসন
১১০ শান্তিপল্লি। কলকাতা ৭০০১০৭

দুই সম্পাদকমশাইকে ধন্যবাদ, এমন একখানা শারদীয় সংখ্যা আমাদের উপহার দেবার জন্য। আমার বয়স এখন ৫০ ছুঁই-ছুঁই, তবু নব আনন্দে মেতেছি মে মাস থেকে, 'সন্দেশ'-এর পুনর্জন্মে। আর শারদীয় 'সন্দেশ' তো এককথায় অনন্য। সত্যিই সবার সেরা।

ভারী ভালো লাগল উজ্জ্বল চক্রবর্তীর উপন্যাস 'অন্ধের নিশানা'। অতি সুন্দরভাবে লেখক ব্যক্ত করেছেন ইতিহাসের পটভূমিতে এক আশ্চর্য রূপকথার গল্প। তবে আবুল বাশারের উপন্যাস ভালো লাগেনি। লীলা মজুমদারের উপন্যাসটাও কেমন-যেন অসম্পূর্ণ! অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসের বিষয়টা ভালো। ভালো লাগল রাজেশ বসুর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'মহাকাশের মৃত্যুদূত'। সুবোধ ঘোষ ও সন্দীপ রায়ের লেখা ভিন্নধর্মী ও মনোগ্রাহী। সুজয় সোমের ওই 'ফালতু খাতা'য় নস্টালজিয়ার আবেশ! অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখাটাকে গল্প না-বলে ভ্রমণকাহিনি বললে বোধহয় ঠিক হত। বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও নবনীতা দেব সেনের মতো নামী লেখকদের গল্পগুলো কেমন-যেন দায়সারা গোছের! ভালো লেগেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা।

শারদীয় 'সন্দেশ' নিয়ে একটু কড়া সমালোচনা করে ফেললাম। তবু এ-কথা বলতেই হবে—নতুন পাকের 'সন্দেশ'-এর সুবাসে মাতোয়ারা না-হয়ে উপায় নেই সাহিত্যপ্রেমী সব বয়সের বাঙালির।

আরতি মজুমদার
ন্যাশনাল পার্ক। নৈহাটি
উত্তর ২৪ পরগনা। ৭৪৩১৬৫

আমি নতুন 'সন্দেশ'-এর নিয়মিত পাঠিকা। নতুন 'সন্দেশ'-এর ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প, ছড়া-কবিতা, বিশেষ রচনা, বিভাগীয় রচনা এবং অলঙ্করণ কী অনন্যসাধারণ মাত্রা লাভ করেছে! আমাদের পাঠকমনকে দিচ্ছে পড়ার আনন্দ, দেখার আনন্দ। এবারের শারদীয় 'সন্দেশ' তো এককথায় অনবদ্য।

শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত পাঁচ রাশিয়ান ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের দিদিমণির লেখা 'আমাদের বাংলা-ক্লাস' পড়ে খুব খুশি হলাম, আমাদের বাংলাভাষাকে ওঁরাও এত ভালোবাসেন জেনে। রাশিয়ার ওই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমি পত্রবন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু ওঁদের ঠিকানা তো জানি না, কী করে যোগাযোগ করব জানালে উপকৃত হব।

তিতির মিত্র
গ্রাম ছেওয়ানচক। ডাকঘর ঘোষপাড়া, বালি
হাওড়া। ৭১১২২৭
নবম শ্রেণী। উত্তরপাড়া মডেল স্কুল

❑ কলকাতায় বেড়াতে এসে ২৯ জানুয়ারি সন্ধেবেলা রাশিয়ান ছাত্রছাত্রীরা ও তাঁদের দিদিমণি 'সন্দেশ'-এর আপিসে এসেছিলেন। তোমার চিঠিটা আমরা ওঁদের দিয়েছি। চিঠিটা পড়ে সকলেই খুব খুশি হয়েছেন। হয়তো ওঁরাই কেউ তোমাকে চিঠি লিখবেন। স স।

'সন্দেশ' নতুন রূপে খুবই সুন্দর, ভারী ভালো লাগছে। আমি ৪০ পেরনো পুরনো 'সন্দেশী'। মাঝে বেশ কিছুদিন কোনও যোগাযোগ ছিল না 'সন্দেশ'-এর সঙ্গে। হঠাৎই এমন ঝকঝকে নতুন 'সন্দেশ' পেয়ে, বড়ই আনন্দিত হলাম।

মনে আছে, ছাত্রজীবনে আসানসোল বইমেলায় পর পর দু'-বছর 'সন্দেশ'-এর স্টলে দোকানদারি করেছিলাম, শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শিশিরকুমার মজুমদারের সঙ্গে।

শংকরদাস চট্টোপাধ্যায়
পি ৪৬ লেকটাউন। ব্লক বি
কলকাতা ৭০০০৮৯

অনেকদিন ধরেই ছোটদের ভালো পত্রিকার বড় অভাব ছিল। বোধহয় ১৯৮০ দশকের শেষদিক থেকেই এটা লক্ষ করেছিলাম। অথচ শুধু ছোটরা নয়, আমার মতো কেউ কেউ সারা জীবন ধরেই ছোটদের বই ও পত্রিকা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। এখনও—এই ৭০ পেরনো বয়সেও—আমার সেই অভ্যেস একটুও বদলায়নি!

২০০৫ সালের মে মাস থেকে নতুন 'সন্দেশ' পড়ে আমার যে মুগ্ধতা, সেটা প্রতি মাসেই আপনাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে টেলিফোনে জানিয়েছি। নতুন 'সন্দেশ'-এর অন্যতম সম্পাদক সুজয়বাবুর সঙ্গে দু'-তিনবার বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার সুযোগও হয়েছে। আগেই যে-কথা টেলিফোনে বলেছিলাম, সেটা আজ চিঠিতেও বলছি—শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, বাংলাদেশেও এই নতুন 'সন্দেশ'-এর জনপ্রিয়তা ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে! তার একটা প্রমাণ—ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ঢাকা, ধানমণ্ডি থেকে কে মমিন-এর চিঠি। ওই একটা চিঠি থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশের মানুষ 'সন্দেশ'কে কী আন্তরিক ভালোবাসে! আপনাদের ঘোষণায় দেখলাম খুব শিগগিরিই গোটা বাংলাদেশে যাতে 'সন্দেশ' পাওয়া যায়, তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা আনন্দ-সংবাদ, সন্দেহ নেই।

আরও আছে। ওই একই সংখ্যায় হাওড়ার বালি থেকে প্রিয় লেখক সরল দে যে বিস্তৃত চিঠিটা লিখেছেন, সেটা এককথায় অনবদ্য। বিদগ্ধ লেখক তাঁর ভাষা ও শৈলীতে যেভাবে নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রতিটা উল্লেখযোগ্য বিষয়কে পর পর সাজিয়ে আন্তরিক প্রশস্তি করেছেন, তাতে অবশ্যই আপ্লুত হতে হয়। 'সন্দেশ' সম্পর্কে কোনও চিঠি যদি আমি আগে লিখতাম, তাহলে আমিও হয়তো একই বক্তব্য পেশ করতাম—আমার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি হয়তো আলাদা হত।

হুগলির বাঁশবেড়িয়া থেকে অভিষেক ভট্টাচার্য নামে যে ছেলেটা চিঠি লিখেছে, তার ওই শেষ অংশটি উল্লেখ করছি: 'বাস্তবের মাটিতে 'মাসে মাসে সেরা সন্দেশ' পেশ করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, বিশেষ করে সেরা দুই সম্পাদক যখন একসঙ্গে রয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সবার মন জয় করে 'সন্দেশ' একদিন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার খ্যাতি অর্জন করবে।' সম্পাদকমশাই, আমিও এই কথা একইরকম প্রত্যয়ের সঙ্গে টেলিফোনে বলেছিলাম, মনে করে দেখুন।

আর-একটা কথা বলি। 'সন্দেশ' এখন যে বর্ণাঢ্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই ধারা বজায় রাখতে হলে প্রচুর অর্থের অবশ্যই প্রয়োজন। আরও অনেক বিজ্ঞাপন চাই, তৎসহ কিছু স্পনসর পেলে আরও ভালো। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, আমার মনে হয় বাংলাদেশে 'সন্দেশ'-এর যাঁরা ডিস্ট্রিবিউটর—একটু কথা বলে দেখুন না—ওঁরাও হয়তো চেষ্টা করলে বাংলাদেশ থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিতে পারবেন। এমনকী কিছু উদারমনা স্পনসরও হয়তো এগিয়ে আসতে পারেন।

এবার একটু অভিযোগ আছে। ২৬ জানুয়ারির 'আজকাল' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা বইমেলায় 'সন্দেশ'-এর স্টলে গিয়ে আমার এক বন্ধুকন্যাকে গ্রাহক করেছি। আমি চেয়েছিলাম আমার এই উপহার ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকেই পৌঁছে যাক তার কাছে। কিন্তু আমার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনাদের

স্টলের জনৈক কর্মী তাকে গ্রাহক করেছেন মে ২০০৬ থেকে। এ-ব্যাপারে আমার প্রবল আপত্তি জানিয়ে দুই সম্পাদককে বিনীত নিবেদন : আমার নববিবাহিতা বন্ধুকন্যা শ্রীমতী তানিয়া সমাদ্দারকে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ থেকেই গ্রাহক করা হোক।

গোপাল আচার্য
৭০ আনন্দ আবাসন
গড়িয়া স্টেশন রোড। কলকাতা ৭০০০৮৪

❑ বইমেলায় 'সন্দেশ'-এর দোকানে যা ঘটেছে, তার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। আপনার বন্ধুকন্যাকে এই সংখ্যা থেকেই 'সন্দেশ' পাঠানো হচ্ছে।
এ-প্রসঙ্গে বলি, বইমেলায় আরও যারা গ্রাহক হয়েছ, তাদেরও কারও যদি এমন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, আমাদের সম্পাদকীয় টেলিফোনে সরাসরি জানাও। প্রতি মাসের 'সন্দেশ'-এ, সেইসঙ্গে 'আজকাল', 'সংবাদ প্রতিদিন' ও 'ভ্রমণ' পত্রিকায়, এমনকী কলকাতা বইমেলার ডিরেক্টরিতে প্রকাশিত 'সন্দেশ'-এর বিজ্ঞাপনে লেখাই তো আছে—যে-কোনও মাস থেকে এক বছরের গ্রাহক-চাঁদা কত। এবারের বইমেলায় চাঁদা-দেওয়া নতুন গ্রাহকরা যে-মাস থেকে 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক হতে চাও—সম্পাদকীয় টেলিফোনে জানাও—সেই মাস থেকেই তোমাদের বাড়িতে 'সন্দেশ' পৌঁছে যাবে। স স।

নতুন 'সন্দেশ' জমে গেছে। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, লেখাপত্র এবং লেআউট ও ছাপার দিক দিয়ে 'সন্দেশ' এখন সেরা বাংলা পত্রিকা। অনেক নামী-দামি ইংরেজি পত্রিকাকে অনায়াসে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে 'সন্দেশ'। আমরা যারা পুরনো 'সন্দেশী', তাঁরা এই নতুন 'সন্দেশ'-এর শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।
নভেম্বর সংখ্যায় বন্ধুবর গৌর বৈরাগীর 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' গল্পটা দারুণ, আর সমীর সরকারের অলঙ্করণ তো অসাধারণ। ঠিক তেমনই সুন্দর সরল দে-র কবিতা 'স্বপ্নের ছায়াছবি'।
আর হ্যাঁ, ভালো লাগছে আমার শিক্ষাগুরু বুদ্ধদেব গুহর ধারাবাহিক উপন্যাস 'ফোটা কার্তুজের গন্ধ'।

মণীশ বসু
১৫ যোধপুর পার্ক। কলকাতা ৭০০০৬৮

আমি একজন ফুটপাতের হকার। গড়িয়াহাট-গোলপার্কের কাছে পুরনো বইয়ের বেচাকেনা করি। আমি সময় পেলেই ছোটদের জন্য ছড়া-কবিতা লিখে থাকি। কোনও শক্ত বিষয়ের উপর আমার লিখতে ভালো লাগে না। তাই চেষ্টাও করি না। যেমন, আমি একদিন দোকানে বসে আছি, আমার কাছে একজন মাঝবয়েসি

ভদ্রলোক এসে বললেন, 'ভাই, 'আবোল তাবোল' আছে? সুকুমার রায়ের বই।' তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল—কী রে বাবা! এখনও 'আবোল তাবোল' পড়েনি! তারপর মনে হল—না, হয়তো উনি বাড়ির কারুর জন্য খুঁজছেন। যাই হোক, আমার ওই কথা মনে হওয়াতেই, আমি দোকানে বসেই তক্ষুনি একটা ছড়া লিখে ফেললাম।
নিজের লেখার মান নিজে বুঝতে পারি না। তাই আপনাদের কার্যালয়ে দুটো নমুনা পাঠালাম। ছাপার জন্য গৃহীত না-হলেও দুঃখ নেই। আপনাদের মতামত পেলে উপকৃত হব।

মোহন দাস
২৩/কে পঞ্চাননতলা রোড
কলকাতা ৭০০০২৯

আমি সেই আগের প্রজন্মের অসংখ্য গুণমুগ্ধ 'সন্দেশ'-পাঠকদের একজন। আজ নবকলেবরে 'সন্দেশ' আমার ন'-বছরের মেয়েকে অনেক আনন্দের খোরাক দিচ্ছে, সেজন্য আমি নতুন করে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
এককালে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছি, এখন শিক্ষকতায় ব্যস্ত। এমন চমৎকার নতুন 'সন্দেশ'-এর দীর্ঘায়ু এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
ডি ৩৩ গ্রিসম স্ট্রিট। বিধাননগর
দুর্গাপুর। ৭১৩২১২

'সন্দেশ'-এর জানুয়ারি ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত রেবন্ত গোস্বামীর লেখা প্রাণময় চিঠি পড়ে আমি এককথায় বিমুগ্ধ। চিঠিটার মধ্যে ফেলে-আসা দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা তিনি যেভাবে করেছেন, লেখকের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। বলতে বাধা নেই, রেবন্তবাবু প্রমাণ করেছেন 'ওল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড।' তিনি দেখিয়েছেন সোনা কখনও রুপো হয় না। আর 'সন্দেশ'? সেটা কখনওই লাড্ডু বা জিলিপি হয় না।
সম্পাদকদ্বয় সন্দীপ রায় ও সুজয় সোমের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্চর্য আধুনিক মাসিকপত্র 'সন্দেশ'-এর মাধ্যমে আপনারা দু'জনে এভাবেই আমাদের প্রজন্মকে অনাবিল আনন্দ দিন। রেবন্তবাবুর মতো আমিও 'সন্দেশ'-এর শতবর্ষ-উৎসবের মুখরিত দিনগুলোর জন্যে আগাম শুভেচ্ছা জানালাম।

মতিলাল মুখোপাধ্যায়
২০বি বি এল সি মিলস্ বাই-লেন। মাহেশ
হুগলি। ৭১২২০২

নতুন 'সন্দেশ' স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। 'সন্দেশ'-এর মে, জুন ও নভেম্বর ২০০৫—এই তিনটে সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারিনি। আপনাদের দপ্তর থেকে ডাকের মাধ্যমে ওই সংখ্যাগুলো কি পেতে পারি?
নতুন 'সন্দেশ'কে আরও আকর্ষণীয় করতে গত ৯৩ বছরের 'সন্দেশ' থেকে সেরা গল্প, কবিতা, কমিক্স বা অন্যান্য রচনা আবার ছাপা হলে, আমাদের ভালো লাগবে।
নতুন 'সন্দেশ'-এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কৃষ্ণদাস বাগ
গ্রাম ও ডাকঘর বরগোদা। পূর্ব মেদিনীপুর

❑ ১৪১২র বিভিন্ন মাসের 'সন্দেশ'-এর সামান্য কিছু কপি এখনও রয়েছে, শুধুমাত্র কুরিয়ার বা ডাকযোগে নিতে পারো। কোন কোন সংখ্যা কিনতে চাও জানিয়ে উৎসাহী পাঠকরা জোড়া-পোস্টকার্ড পাঠাও, অথবা সরাসরি কথা বলো সম্পাদকীয় টেলিফোনে। স স।

আজকাল বে-ব্লেড ও বার্বি, এস এম এস ও টিভির যুগে, যেখানে পড়াশোনা ও কেরিয়ার চয়েস-এর ভারে ছোট ছেলেমেয়েদের শিশুত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে 'সন্দেশ'-এর পুনরাবির্ভাব প্রশংসনীয়। স্কুলের পড়াশোনা ও টেলিভিশন-ইন্টারনেটের বাইরের এই সুন্দর পৃথিবীটাতে যারা নিশ্বাস নিতে পারছে না, আমি তো তার জন্য তাদের বাবা-মায়েদেরই দোষ দেব।
নতুন 'সন্দেশ' আমাদের ছোটবেলার নিষ্পাপ ও উদ্বেগহীন দিনগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকটি আইটেম অতি উচ্চমাপের এবং সহজবোধ্য।
হ্যাটস্ অফ টু দি এডিটোরিয়াল টিম।

রাখি বালী
৭৬ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭

জয়নাল আবেদিন

একুশ এলেই

একুশ এলেই পলাশবনে আগুন জ্বলে ওঠে
একুশ এলেই হৃদয়বনে রক্তজবা ফোটে।

একুশ এলেই মায়ের বুকে কান্না জমে থাকে
একুশ এলেই বোনের চোখ ভায়ের ছবি আঁকে।

একুশ এলেই আপনভাষায় কথা বলার সুখ
একুশ এলেই ভাসতে থাকে শহিদ দাদার মুখ।

একুশ এলেই বাংলা শুধু, পড়ে থাকে কাজ কাম
একুশ এলেই সামনে দাঁড়ায় বরকত, সালাম।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

জলহস্তী স্থলহস্তী

চণ্ডী লাহিড়ি

হাতিটাকে মেরে গজদন্তটা
নিতে হবে—

ছোট দাঁতেই তোকে
চিবিয়ে খাবো!

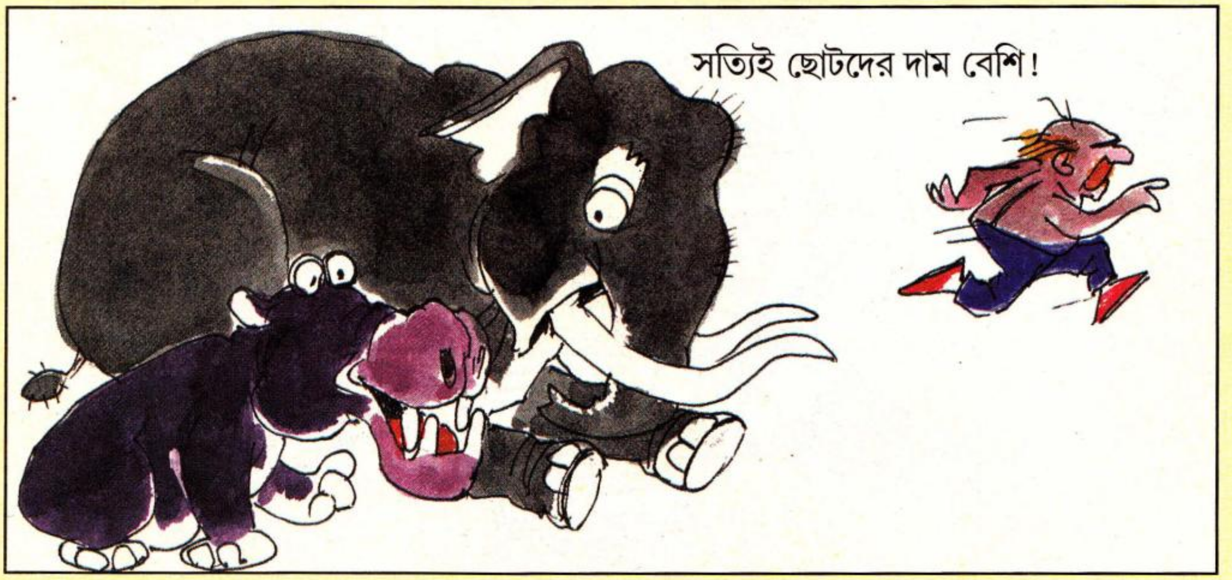
সত্যিই ছোটদের দাম বেশি!

অল্পবয়স কল্পবয়স

শঙ্খ ঘোষ

নম্বর দেবার খেলা

ভাইবোনদের ওপর খবরদারি করতে কার-না ভালো লাগে! আমার অন্তত লাগত। অসুস্থতার জন্য ছোটভাই কিছুদিন ইস্কুলে যেতে পারছে না বলে তার মনখারাপ। পড়াশোনা সে ভালোবাসে। ইস্কুলে যাক বা না-যাক, ঘরে শুয়ে নিজে নিজেই সে এগিয়ে নেয় পড়া। কিন্তু এগোচ্ছে যে, সেটা জানা যাবে কেমন করে? কতটা পড়ছে কতটা জানছে, তার তো পরীক্ষা হচ্ছে না কিছু। হওয়া কি উচিত নয়?

আমি তাই বলি একদিন, নিজের পড়া থামিয়ে : 'শোন, প্রশ্নপত্র তৈরি করে দেব আমি, আর তুই দিবি পরীক্ষা। খাতা দেখব আমি, নম্বর দেব। ঠিক আছে?'

ঠিক আছে। সে খুব রাজি।

পাঠ্যপরিধি নির্দেশ করা গেল তখন। মন দিয়ে তৈরি করা গেল প্রশ্নপত্র, বাবাকে যেমন করতে দেখেছি। তারপর একদিন, ঠিক যেমন হয় ইস্কুলে, দশটার সময়ে তাকে বসিয়ে দিই পরীক্ষায়।

গম্ভীর হয়ে লিখতে থাকে সে। তার চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে আমি ঘোরাঘুরি করতে থাকি তার কাছাকাছি, একেবারে ইন্‌ভিজিলেটরের কায়দায়। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে নিই কতটা-কী লিখছে।

হঠাৎ একটা ভুল চোখে পড়ে। জানি যে সে-ভুলটা ওর হবার নয়, নিতান্তই বেখেয়ালে ঘটে গেছে ওটা। তা বলে কি আমার কোনও প্রতিক্রিয়া থাকতে নেই?

হতাশ মুখভঙ্গিতে চলে আসি রান্নাঘরে। মা বসে বসে রাঁধছেন। আশেপাশে দু'-পাক ঘুরে, মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছি আমি : 'এত কেয়ারলেস! সাধারণ একটা জিনিসে ভুল করে বসে!'

শুনে, মা একটু মুখ মুচকে হাসে।

এ কী! এরকম একটা দুশ্চিন্তার কথায় মা হাসে কেন? বেরিয়ে আসি বাইরে। মা-র কি তবে বাবার কথাটা মনে পড়ে গেল?

কয়েকদিন আগে, বাবা যখন ঘোরাঘুরি করছিলেন উঠোনে, আর আমার বিষয়ে মা যখন জিজ্ঞেস করছিল : 'ওর আজ পরীক্ষা হলো কেমন?'—বাবা তখন একরাশ বিরক্তি মুখে নিয়ে বলেছিলেন, 'কী আর বলব! এত কেয়ারলেস! জানা জিনিসেই ভুল করে বসে!'

সেই কথাটা মনে করেই নিশ্চয় হাসল মা? আমি কি বাবাকে নকল করলাম তবে?

নকল অবশ্য করতাম ঠিকই। দেখতাম চৌকির ওপর কাত হয়ে শুয়ে লম্বা একখানা কাগজে খোপ কেটে কেটে ইস্কুলের রুটিন তৈরি করছেন বাবা। ওইরকম রুটিন বানাবার ইচ্ছে হলো আমারও। কিন্তু আমার তো-আর জ্যান্ত একটা স্কুল নেই, রুটিন হবে কীসের? কল্পনায় তাই বানিয়ে নিলাম স্কুল, বানিয়ে নিলাম অনেক অনেক মাস্টারমশাইয়ের নাম, আর লম্বা কাগজে লাইন টেনে নিয়ে আমিও তৈরি করতে লাগলাম জবরদস্ত একখানা রুটিন, কাত হয়ে শুয়ে শুয়েই। সে-রুটিন নির্মাণে সবচেয়ে আনন্দের ছিল নামকে ছোট করে নেওয়া। নিশিকান্ত সেনকে আমরা নিশিবাবুই বলি, কিন্তু রুটিনে দেখি : এন কে এস। হেডমাস্টারমশাই এইচ ডি এম, হেডপণ্ডিত এইচ ডি পি। আমাকেও তো করতে হবে তা।

আরেকটা নকল ছিল পরীক্ষার খাতা দেখায়। নম্বর বসানোয়।

গরমের ছুটি এলে মন ভালো হয়ে যায়। লম্বা ছুটি, স্কুল খুললেই পরীক্ষার তাড়া নেই, আমজামলিচুর ঢালাও অবসর। আর এইসবের সঙ্গে বাড়তি একটা টান—এই সময়টায় বাবা ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতা দেখবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনের খাতার বান্ডিল এসে পৌঁছয় ডাকঘর থেকে, সঙ্গে আসে লাল-নীল পেনসিল, গালা, মার্কশিট, খাম। একটা সময়ে খোলা হয় বান্ডিল। আর, ওইরকমই কাত হয়ে শুয়ে, বাবা দেখতে থাকেন খাতা। পাশে বসে বসে আমি দেখতে থাকি বাবার সেই দেখাটাকে।

যখন সেভেন বা এইটে পড়ি, তখন তো শুধু দেখাটাকেই দেখি। কিন্তু নাইনে উঠবার পর, টেনে উঠবার পর, আমার তো খানিকটা জানাও হয়ে যায় বিষয়টা। আমরা যে বাংলা বই পড়ছি এখন, তার থেকেই তো পরীক্ষা।

কোন প্রশ্নের উত্তরে কীরকম লিখলে কীরকম নম্বর পাওয়া যায়, তার একটা আন্দাজ হচ্ছে একটু একটু করে। আচ্ছা, তাহলে তো আমিও নম্বর দিতে পারি? এতসব দেখে দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে কেমন লিখলে কত দেওয়া যায়!

নতুন একটা খেলা শুরু করি তখন। একটু পরেই যে-খাতাটা বাবা দেখবেন, আগেই সেটা পড়ে ফেলি মন দিয়ে। পড়ে, একটা কাগজ নিয়ে, উত্তর ধরে ধরে আন্দাজমতো এক-একটা নম্বর বসাতে থাকি আমি।

তারপর যখন বাবা দেখেন সেই খাতা, বাবা বসান নম্বর, মিলিয়ে দেখি আমার দেওয়া নম্বরের সঙ্গে ফারাক কতটা হলো। কাছাকাছি মিলেও যায় যখন দু'-একটা, সগর্বে দেখাই সেটা। আর মেলে না যখন, কম হয় বা বেশি হয়, জিজ্ঞেস করি তার কারণ। বাবা অবশ্য রাগ করেন না। বুঝিয়ে বলেন কেন পেল বেশি বা কেন পেল কম।

এইরকমই দেখতে দেখতে, একদিন একটা কাণ্ডই হলো হঠাৎ।

ব্যাখ্যা লিখতে হবে তিনটে, মোট নম্বর কুড়ি। ভাগ হবে কীভাবে? দুটো থাকে গদ্যাংশের ব্যাখ্যা, ছয় আর ছয় বারো। আর অন্যটা হলো পদ্যাংশের, তার জন্য বরাদ্দ আট। এই হলো কুড়ি।

মন দিয়ে খাতা দেখছেন বাবা। পাশে বসে নজর রাখছি আমি। একটা ব্যাখ্যা দেখা শেষ হলো। সুন্দর করে লাল পেনসিলে নম্বর বসালেন : ৬। আর সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরোল আমার মুখ থেকে।

চমকে উঠলেন বাবা। বললেন, 'কী হলো?'

'ওটা তো গদ্যের ব্যাখ্যা। পদ্যের তো নয়।'

অবাক চোখে তাকিয়ে বাবা বলেন, 'হ্যাঁ, তাতে কী?'

'ওটাতে তো পুরো নম্বরই ছয়। ওটা তো আট নম্বরের ব্যাখ্যা নয়।'

'তা তো নয়। কিন্তু তাতে কী হলো?'

'মানে, ও ছয়ের মধ্যে ছয় পেল?'

'হ্যাঁ, তাই তো পেল।'

'পাওয়া যায় এ-রকম?'

'যাবে না কেন? সব কথা ঠিকঠাক লিখেছে, ভাষা সুন্দর, কোনও বানানভুল নেই। পাবে না কেন নম্বর?'

'বাংলা-ইংরেজিতে পুরো নম্বর নাকি দিতে নেই?'

'কে বলল দিতে নেই? ভালো লিখলেই দেওয়া যায় ভালো নম্বর।'

পরের উত্তরটা দেখতে শুরু করেন বাবা। কিন্তু একটু পরেই, পাতা উলটে ফিরে আসেন আগের ব্যাখ্যাটার দিকে। হাতের লাল পেনসিল এগোতে থাকে ওই নম্বরটাকে লক্ষ্য করে।

এই রে! ওই পরীক্ষার্থীর কি কোনও ক্ষতি করে দিলাম আমি? দ্বিতীয় চিন্তায় বাবা কি তবে নম্বরটা পালটে দিতেই যাচ্ছেন?

পেনসিলের ছোঁয়া লাগল খাতায়। কিন্তু না, কমল না নম্বর। দেখি, ৬-এর পাশে একটা বন্ধনীর মধ্যে লিখে দিচ্ছেন বাবা : ফুল মার্ক। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হয়তো স্ক্রুটিনিয়ার বা হেড এগজামিনারও তোরই মতো ভাবতে পারেন যে আমি ভুল করেছি, আট নম্বরের প্রশ্ন ভেবেই ছয় বসিয়েছি। তা যে নয়, স্পষ্ট করে সেটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো।'

আমার একটা আরাম হলো মনে। ভালো লিখলে, ঠিকঠাক লিখলে, বাংলাতেও তবে পুরো নম্বরই পাওয়া যায়!

খবরটা আজই গিয়ে বলতে হবে বন্ধুদের।

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

দীপ মুখোপাধ্যায়

এট্টুকু ছেলে

ধুলোবালি মাখা এট্টুকু ছেলে
বেসপতিবার সেদিন বিকেলে
ফুটিফাটা মাঠে নদীপাড় ধরে
ঘাসপাতাগাছ রেখেছে নজরে।
ঝুপ করে দেখি নেমেছে আঁধার
সুনসান পাড়া আদার পাদার
ধোঁয়া থেমে আছে আকাশের গায়ে
এট্টুকু ছেলে ঘরে ফিরে যায়।
পায়ে লেগে আছে দুটো চোরকাঁটা
ঝিমোচ্ছে সাদা ছাগলছানাটা
মাদলের বোল দ্রিদিম দ্রিদিম
শাঁখ বেজে ওঠে জ্বলছে পিদিম।
উঠোনে তখন ছায়া নড়েচড়ে
এট্টুকু ছেলে পড়াশোনা করে।

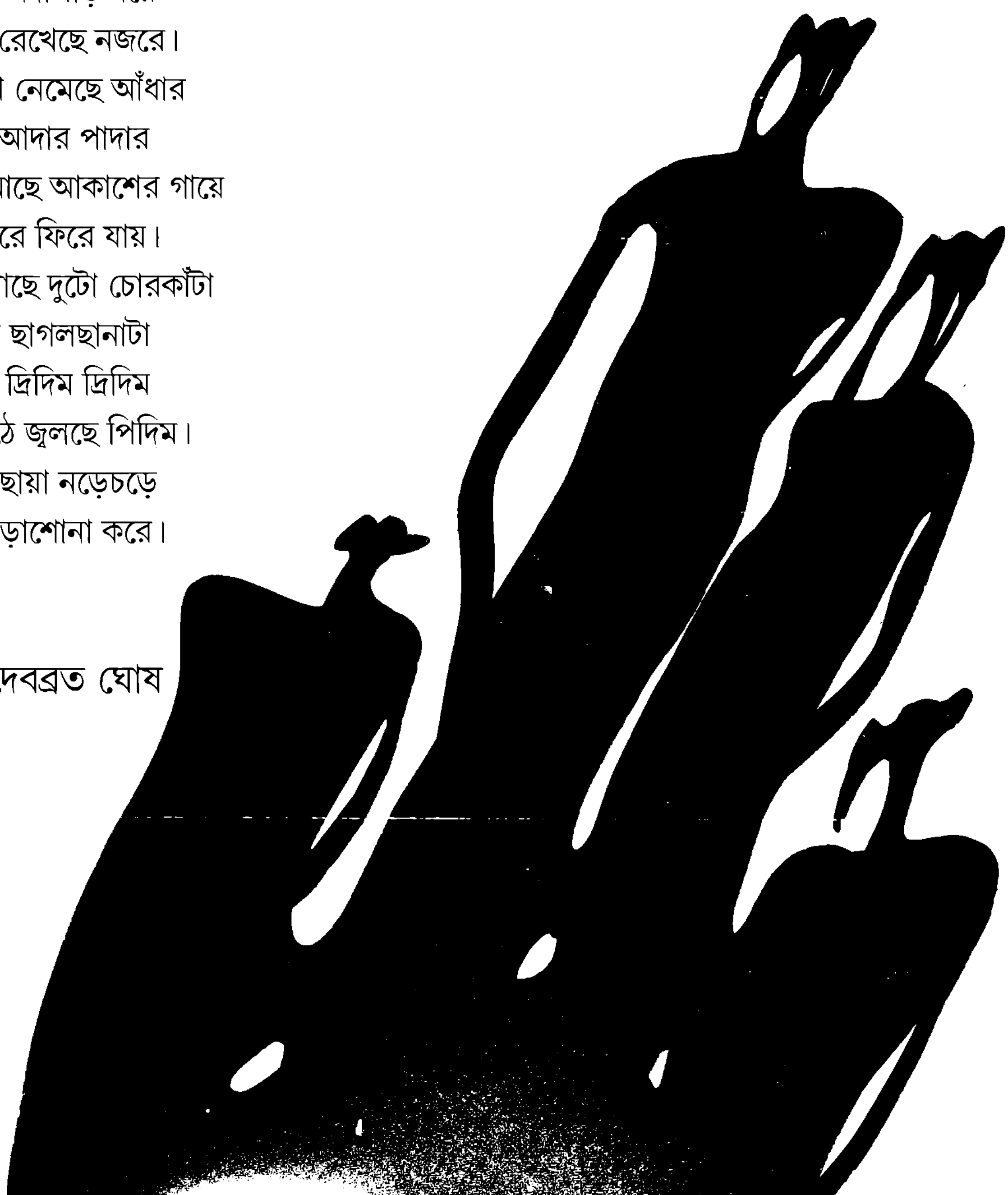

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

ফুরুজানি

শুনতে চাও তো শোনো বসে গল্পখানা। দেখো বাপু, টিকে-ক'টি না নিবে যায় পুরো, তাহলে-পরে ব্যাপারটুকু বলতে পারি একটানা।

তো টিকের আগুন পুড়পুড় করে জ্বলছে, আর গল্পও চলছে সমে-সমে ঠেকে-ঠেকে।

গল্প হল ফুরুজানি আর দেমাজানা—দুই ভাইবোনের গল্প।

দু'জনে অনেকদিনের পরে যাচ্ছে মামার বাড়ি, সে ঢের দূরের গাঁ! কাজেই সক্কালবেলা বেরিয়েছে, তারপর থেকে হেঁটেই চলেছে একটানা। হাঁটতে হাঁটতে রোদও বাড়ে, দমও ছুটে যায় যেন! শেষে পাহাড় পড়ল একখানা। তার একটেরে নীচে একটা গুহাও দেখা যায়। তাহলে জিরিয়ে নিতে আর

কালো মানুষের উপকথা • দক্ষিণ আফ্রিকার খোসা উপজাতির গল্প

আর দেমাজানা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাধা কি দু'-দণ্ড? কিন্তু এগিয়ে দ্যাখে একখানা বিশাল পাষাণ আগলে আছে সামনেটাতে, গুহামুখ জাম্, বন্ধ। তো তারা সামনে দাঁড়িয়ে তখন সুর করে বলে ওঠে:

'খোলো ঘর খোলো, গুহার মুখের পাষাণ সরাও।
ঢুকি, এককোঁটা জিরোই, খোলো গো, পথ করে দাও।'

পর-পর একবার দু'-বার তিনবার বললে-পরে তিনবারের বারে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে আচমকা গুহামুখ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল বিশাল পাষাণচাঙাড়িখানা। একটা চকমকি ঘষে আলো করে ভেতরে ঢুকে দ্যাখে দিব্বি তকতক করছে ঘর। এক কোনাতে খানিকটা মাংস কে রেখে গেছে পাতার ওপরে—কাঁচা, না মশলাটশলায় জারানো-ঝলসানো, কে জানে!

তো মাংস দেখে ফুরুজানি বলে ওঠে, 'দেমাজানা সাবধান, ওদিকে যাবি না। ছুঁবি না, চাইবি না, মুখে ঠেকাবি না ও-মাংস। কোণে গিয়ে বসে জিরো দু'-দণ্ড। পাথর টেনে মুখ আটকে দিয়ে এবার মামাবাড়ি খবর করে আসি।' বলে গুহা থেকে বেরিয়ে বলে ওঠে:

'দে টেনে আগল, গুহামুখ বাঁধ, পাহাড়ে পাষাণ।
দেখিস, না-ঢোকে জানোয়ার, দানো, কোনও শয়তান।'

একবার দু'-বার তিনবার বলতে বলতে বিশাল পাষাণচাঙাড়িখানা ঘড়ঘড় আওয়াজ করে সরে এসে বন্ধ করে দিল গুহামুখ। ফুরুজানি নিশ্চিন্ত হয়ে মামাবাড়ি তালাশে চলল।

এদিকে সে-ও গেছে, আর প্রায় তখুনি ফিরে এসেছে সেই গুহাবাসী রাক্ষস, সে-এক জিম্ রাক্ষস। সে এসে হাতের ঠেলা দিয়ে মুখের পাথরখানা সরাতে যায় আর বলতে থাকে—একবার দু'-বার তিনবার:

'খোল গুহা খোল, সরা পাথর—
খোল ঢুকি, খোল গুহার দোর।'

তো সে-পাথর একচুল নড়ে না। তখন সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে-রে ঢুকেছিস আমার গুহাঘরের ভেতরে? ভালো চাস তো খুলে দে পাথরখানা—'

আর, ভেতর থেকে দেমাজানাও চেঁচিয়ে ওঠে:

'গুহা খুলব না। খবরদার!
জানি, নোস তুই ভাই আমার।'

গুহা খুলল না হাজার ঠেলাঠেলি করেও। তখন সে-জিম্ রাক্ষস গেল আরও জিমেদের ডেকে আনতে। জিম্পাড়ায় গিয়ে সে হাঁক দেয়: 'শোনো জিম্ ভাই, শোনো জিম্ ভাই, মান্ষের বাস কইছে গুহায়, আমারই গুহায়—'

শুনে এ-দোর ও-দোর খুলে অমন বিশ-পঞ্চাশ অতিকায় রাক্ষস বেরিয়ে এসেছে হড়বড় করে, 'বলিস কী, সত্যি কথা?'

'তবে বলছি কী! হাতে ঠেলা দিলে মুখের যে-পাথর গড়গড় করে সরে যায়, হাজার জোর খাটিয়ে মন্তর আউড়েও তা খুলল না কেন? ভেতর থেকে মান্ষের বেটি আবার ধমক লাগাল 'খবরদার!' বলে!'

'এই কথা? তাহলে এক কাজ কর। একখানা কুডুল আগুনে পুড়িয়ে নরম করে নিয়ে গিলে ফ্যাল। তারপর ঠ্যালা দে গিয়ে। দ্যাখ, কত জোর আছে পাথরের!'

তো সে-জিম্ তার কুডুলখানা আগুনে গালিয়ে তপ্ত গিলে ফেলল তখুনি খপ্ করে। আর বলব কী, গেলামাত্র তার মনে হল গোটা পাহাড়টাই সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, এত বল হয়েছে গায়ে! টের পেতেই আর দেরি না, তুরিতে ফিরল সে তার গুহার মুখে। গিয়েই হাঁক দিল:

'খোল গুহা খোল, সরা পাথর।
ভালো চাস খোল গুহার দোর—'

বলে চাড় দিল সে পাথরে দু'-হাতে। আর ব্যস! সরসর করে মুহূর্তেই সরে গেল অতখানি পাষাণচাঙাড়ি। গুহা খুলে গেল। দ্যাখে, ভেতরে একটা ছোট আলো জেলে এককোণে বসে একটা মেয়ে! আরেক কোণে মস্ত একখানা পাতায় জারানো-ঝলসানো এতখানিটা কে-জানে কী মাংস!

মাংসই তো বটে! মাংস দেখে সে আর মেয়েটার দিকে তাকাল না। সেদিকে গিয়ে বসে পড়ে দু'-হাতে খেতে লেগে গেল তখুনি একমনে।

কিন্তু সে ফুরোতে আর কতক্ষণ!

কিন্তু দেমাজানা তারই মধ্যে একটা কুঁকড়িকে ডেকেছে বাইরে থেকে। ডেকে বলে, 'হ্যাঁ-রে কুঁকড়ি, তোকে যদি খুঁজতে পাঠাই আমার ফুরুজানি ভাইকে, তো কী বলবি গিয়ে?'

'কেন! বলব—কোঁক্কড়-কোঁ কোঁক্কড়-কোঁ, দানা কুঁড়ো যা পাস—সব এনে থো!'

'না বাপু, তোমায় দিয়ে হবে না।'

সে তখন ডাকল বাইরে-চরা একটা শুয়োরকে : 'হ্যাঁ-রে, তোকে যদি আমার ফুরুজানি ভাইকে গিয়ে খবর দিতে বলি, তো কী বলবি গিয়ে?'

'কেন, বলব—নেহেঁহেঁহেঁ খাবার দে, ঘরে তুলিস না, পুরোটা দে!'

'না বাপু, তোমায় দিয়ে হবে না।'

মাঠ-শোঁকা ছাগলটাকে ডাকল সে তখন, 'হ্যাঁ-রে, তোকে যদি আমার ফুরুজানি ভাইকে ডেকে আনতে বলি, তো কী বলবি গিয়ে?'

ছাগল বলে, 'কেন, বলব—ম্যাঁহ্যাঁহ্যাঁহ্যাঁ ম্যাঁহ্যাঁহ্যাঁহ্যাঁ—যা-পাস নিয়ায় মুখে দি, হ্যাঁ—'

দেমাজানা বলে, 'বুঝেছি।'

ড্যাবডেবিয়ে তাদের দিকে চেয়ে-থাকা আলাভালা গাধাটাকে সে তখন ডাকল, 'হ্যাঁ-রে, তোকে যদি বলি আমার ফুরুজানি ভাইকে গিয়ে ডেকে আন, তো কী বলবি গিয়ে?'

'কেন, বলব—'

বলে চিঁহিঁহিঁহিঁহিঁ করে পেল্লায় একখানা ডাক ছাড়ল গাধা মুখে-মুখে।

তখন দেমাজানা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে গাছে-বসা ঘুঘুটাকে ডাকল হাত নেড়ে।

ঘুঘু উড়ে এসে বসলে সে বলে, 'হ্যাঁ-রে ঘুঘু, তোকে যদি আমার ফুরুজানি ভাইকে ডাকতে পাঠাই, তো কী বলবি গিয়ে তাকে?'

'কেন? উড়ব গিয়ে মাথার ওপরে, যেখানে সে বসে আছে পাঁচজনার মাঝখানে। তারপর উড়তে উড়তে বলব :

'ঢিল মারলে ঢিল খাব? তো মেরেই দ্যাখ, কিন্তু কী?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
তীর মারলে তীর খাব? তো মেরেই দ্যাখ! চিন্তা কী?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
কিন্তু আগে ফুরুজানি কোথায় আছে—কও দিকি?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
বোনটাকে তার খাচ্ছে ছিঁড়ে, খবরটুকু দেও দিকি!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
মস্ত হেঁড়ে জিম্ রাক্ষস—কামড় কী! তার চিমটি কী!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে, বুঝি গিলল এবার মুণ্ডুটি!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।

...হবে?'

তো দেমাজানা তখন বলল, 'তুই ফিরে আয়, তারপর তোকে সবজে-তাজা মটরদানা আর ভুট্টার শিষ ছাড়িয়ে দেব, যত চাস খাস।'

পাখি উড়ে গেল।

অনেক পথ উড়ে শেষে এক গাঁয়ের এক খামারবাড়ির মুখে গোল হয়ে বসে আছে ক'জন লোক। ঘুঘু গিয়ে বসল যেই খামারের ঘন বেড়ার একটা খুঁটোর ওপরে, একজন লোক অমনি উঠেছে তাকে দেখে—'রোজ রোজ এসে দানা খেয়ে যাস, চানা খেয়ে যাস, তাই না? আজ পেয়েছি হাতেনাতে, আজকে খা এই ঢিল—'

আরেকজন লোকও তখনই উঠেছে তারপর : 'রোজ রোজ এসে দানা খেয়ে যাস, চানা খেয়ে যাস, তাই না? আজ পেয়েছি বাগে। তবে আজকে খা এই তীর—'

তো ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে এধার থেকে ওধারে গিয়ে বসে পাখি—ঢিল লাগে না, তীরও লাগে না গায়ে। কতক্ষণ পরে তাদের মাথার ওপর ওপর উড়তে উড়তে ফের সে বলতে লেগেছে :

'ঢিল মারলে ঢিল খাব? তো মেরেই দ্যাখ, কিন্তু কী?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
তীর মারলে তীর খাব? তো মেরেই দ্যাখ! চিন্তা কী?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
কিন্তু আগে ফুরুজানি কোথায় আছে—কও দিকি?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
বোনকে যে তার খাচ্ছে ছিঁড়ে, খবরটুকু দেও দিকি!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
মস্ত হেঁড়ে জিম্‌ রাক্ষস—কামড় কী! তার চিমটি কী!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে, বুঝি গিলল এবার মুণ্ডুটি!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।'

যে ঢিল ছুঁড়ছিল, আরও ক'টা ঢিল ছুঁড়ে ড্যানা টাটিয়ে সে তখন বলছে, 'ওই! ওই! উঠোনে ভেতরটাতে গিয়ে বসল।'

সেখানে পর পর দুটো তীরও এসে বিঁধে পড়ল মাটিতে।

তো ঘুঘুপাখি সোজা উড়ে গেল—একজন লোক কোনাতে বসে গোরু দুইছিল, তার ঠিক মাথার ওপরকার ডালটাতে। ফুরুজানিদেরই মামার বাড়ি সেটা। রাতে মহাভোজ হবে, পিঠে-পায়েস হবে ভোজে। তো তারই দুধ দুইছে ফুরুজানি আপন হাতে।

বাইরের লোকেরা সেখানেও ধাওয়া করে এসেছে। তো পাখি এ-ডাল সে-ডাল খানিকক্ষণ ওড়াউড়ি করে, মাথায় চক্কর দিতে দিতে ফের বলতে লেগেছে :

'ঢিল মারলে ঢিল খাব? তো মেরেই দ্যাখ, কিন্তু কী?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
তীর মারলে তীর খাব? তো মেরেই দ্যাখ! চিন্তা কী?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
কিন্তু আগে ফুরুজানি কোথায় আছে—কও দিকি?
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।

বোনটাকে তার খাচ্ছে ছিঁড়ে, খবরটুকু দেও দিকি!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।
মস্ত হেঁড়ে জিম্‌ রাক্ষস—কামড় কী! তার চিমটি কী!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।

পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে, বুঝি গিলল এবার মুণ্ডুটি!
কান্‌তিকিন্‌তিকিন্‌তিকি।'

ফুরুজানি শুনে বলে, 'এ তো আমারই বোনের কথা। আমারই বোনের খবর এনেছে পাখি!'

রইল পড়ে গাই দোয়া! তখুনি উঠে সে এক কলসি জ্বালানি তেল আর এক আঁটি শুকনো কাঠ কাঁধে নিয়ে ছুটল গুহার দিকে। তারপর গুহামুখে জ্বালানি তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল কাঠক'টা জড়ো করে। আর আগুন তখুনি ধাওয়া করল—আর-কোনওদিক না—শুধু জিমের মাথা লক্ষ্য করে।

জিমের তখন মাংসটুকু খাওয়া প্রায় সারা, আর দেমাজানা ফাঁক খুঁজছে কোনওমতে হাত গলে পালাবার, এমন সময় আগুন ধরে ফেলল জিমের মাথার চুলগুলো।

জিম্ বলে, 'দ্যাখ তো দেমাজানা, কী আমার মাথার কাছটাতে ভোঁ-ভোঁ করতে লেগেছে!'

দেমাজানা বলে, 'না-গো জিম্‌দাদু, বাইরে মেঘ জমেছে তো চাপ হয়ে, তারই শব্দ।'

আগুন ততক্ষণে চুল বেয়ে নেমেছে তালুতে। জিম্ বলে, 'দেমাজানা, দ্যাখ তো, মাথার ভেতরে কী ঢুকে ভোঁও-ভোঁও করতে লেগেছে!'

দেমাজানা বলে, 'বড্ড কষাড়ে মেঘ গো জিম্‌দাদু! তুমি মাংসটা পুরো খেয়ে শেষ করো তো আগে।'

কিন্তু ততক্ষণে জিমের পুরো মাথাটা থেকে আগুনের শিস উঠছে ফোয়ারা দিয়ে। সে আর কোনওমতে বসতে না-পেরে, উঠে ছুট দিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল পাশের জলা ডোবাটাতে মাথা-মুখ ডুবিয়ে। হেঁটোও জলে, মুড়োও জলে, মাঝখানে পিঠটা কেবল জেগে জলের ওপরে।

এদিকে হয়েছে কী, ক'জন অল্পবইসি ছেলেমেয়ে জ্বালানি কাটার মনে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে তখন সেখানে।

'ইশ! ইশ! একটা মৌচাক, দ্যাখ—'

মৌমাছিরা বেরিয়ে গেছে, চাক ভর্তি খালি মধু। তো সে-মধু চেখে চুষে খেতে খেতে পুরো চাকটাই নিয়েছে তারা পেড়ে, আর রেখেছে গিয়ে সেই জিমের জলভাসি পিঠটার ওপরে। আর সে-পিঠ থেকে কেঁকে তুলে খাচ্ছে গড়িয়ে-পড়া মধুর ধারা। আর এমনি খাবার ঝোঁকে—আহা-গো! একটা ছেলের হাত আটকে গেল পিঠে, সেই মধুর আঠায়। টানাটানি ঠ্যালাঠেলি কিছুতে খোলে না হাত! শেষে কবজি থেকে তুলতে হল হাতখানা কেটেই।

সেই থেকে চাউর হয়ে গেছে গল্পটা। এই সে-পুকুর, যেখানে জিমের পিঠ থেকে হাত ছাড়াতে কবজি কেটে বাদ দিতে হয়েছিল গাঁয়ের ছেলের।

আর, এই সে-পুকুর, যেখানে জিম্ রাক্ষস মরেছিল ফুরুজানি আর দেমাজানার হাতে নাকাল হয়ে।

ব্যস! আর নয় বাপু। টিকেও নিবে গেছে। তামাকের মৌতাতটাও কেটে গেল। এখানেই ফুরোলো আজকের গল্প।

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

নবনীতা দেব সেন

হিং টিং ছট

ন তুন বছরের বইমেলা এলো, দিব্যি চলেও গেল। মেলার জন্যে মনকেমন করতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। বইমেলায় সেদিন বাবুসোনা গিয়েছিল। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ফিরে এসে আমাকে বলেছে, 'জানো দিদিভাই, কাদের স্বচক্ষে দেখলাম? মহাশ্বেতা দেবী আর মৃণাল সেন!'

সত্যিই তো, মস্ত দু'জন মানুষকে দেখে এসেছে বাবুসোনা। বইমেলা কি শুধু বইয়েরই মেলা? মানুষেরও মেলা যে!

আমাকে বাবুসোনা ওরকম বলতেই, আমিও উলটে বলি, 'কেন, আমিও তো দেখেছি কত বড় বড় মানুষকে! হ্যাঁ, মস্ত মানুষদের স্বচক্ষে দেখেছি! রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধি!'

ছানাবড়া চক্ষু করে বাবুসোনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আসল রবি ঠাকুর? আসল গান্ধি? মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি? ওঁদের স্বচক্ষে দেখেছ তুমি? য্যাঃ!' বলে মুখখানা যা-বিচ্ছিরি করল-না—কে বলবে ওর আসল মুখটা অত মিষ্টি!

'কিন্তু ওঁরা তো অনেক, অনেক বুড়োমানুষ! তুমি ওঁদের স্বচক্ষে কেমন করে দেখতে পাবে? কবেই তো বাইশে শ্রাবণ—'

'কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলুম, তখনও ওরা ছিলেন যে! ছোটবেলায় আমার মা-বাবার সঙ্গে আমি ওঁদের দেখেছি। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে, শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরীতে, যে-যাঁর আশ্রমে। আর গান্ধিজিকে দেখেছি প্রার্থনাসভায়। সেটাই তো তাঁর নিজস্ব জায়গা। কলকাতাতেই দেখেছি। তাঁর সবরমতী আশ্রমে গেছি অনেক পরে। এই-তো ২০০০ সালে।'

'কলকাতায় থাকতেন গান্ধিজি? তিনি এই কলকাতার লোক? আমি তো ভেবেছি বুঝি পোরবন্দরে থাকেন—'

'ধ্যাৎ। তোর দুটো ধারণাই ভুল। পোরবন্দর তাঁর জন্মস্থান, কর্মস্থল নয়। সারা ভারতবর্ষ তাঁর কর্মস্থল ছিল। কলকাতায় এলে, তিনি প্রার্থনাসভা ডেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন, একসঙ্গে প্রার্থনাসংগীত গাইতেন, দু'-চারটে জরুরি কথাও বলতেন জনসাধারণকে। ওই বক্তৃতা আর কী। গান্ধিজি সারা দেশের 'বাপুজি' ছিলেন। সারা দেশেই ঘুরে বেড়াতেন।'

'হ্যাঁ, জানি। থার্ড ক্লাস ট্রেনে চড়ে, নেংটি পড়ে, লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে। চোখে গোল-গোল চশমা, পায়ে চটি না খড়ম একটা কিছু। ভীষণ সিম্পল, তাই ওঁকে 'দ্য নেকেড ফকির' বলতেন সাহেবরা। এ-সব আমরা জানি। চরকা কেটে, সুতো বানিয়ে, খদ্দরের কাপড় বানাতেন, আর বিলিতি কাপড়চোপড় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতেন। লোকে যাতে দিশি খদ্দরই পরে, বিলিতি মিলের তৈরি কাপড় না-পরে। এইসব তিনি করতেন ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করতে। দিদিভাই, তুমি কি খদ্দর পরো? নাকি বিলিতি কাপড়? এইটে কী পড়ে আছ?'

'আমরা এখন সবই পরি, ভাই। কিন্তু আমার শাশুড়ি-মা খদ্দর পরতেন। আর আমার মা অল্পবয়সে খদ্দর পরতেন, আর নিয়মিত চরকা কাটতেন। আমার মায়ের একটা চরকা অনেকদিন ওঁর শ্বশুরবাড়িতে তুলে রাখা ছিল যত্ন করে।'

'কোথায় দেখলে তুমি গান্ধিজিকে? কী করছিলেন তিনি? চরকা কাটছিলেন?'

'না-না, তাঁকে দেখেছি প্রার্থনাসভায়। আমি বসে আছি বাবার কাঁধে, সামনে শুধু কালো-কালো মাথার ঢেউ-খেলানো সমুদ্র! তারমধ্যে একটা মাচা বাঁধা হয়েছে উঁচু করে। সেই মাচার ওপরে—আমরা স্পষ্ট দেখলাম—গান্ধিজি বসে আছেন! সঙ্গে আরও দু'-একজন। আর গান্ধিজি গাইছেন সেই রামধুন প্রার্থনাসংগীত। জানো তো গানটা?

রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সবকো সন্‌মতি দে ভগবান।

তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাততালি দিয়ে দিয়ে সেই সভায় জড়ো-হওয়া শত-শত মানুষও ভজন গাইছে। গলা মিলিয়ে ছিলুম আমিও।'

বাবুসোনা স্তব্ধ। আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে যাচ্ছে বলে মনে হল আমার। দিদিভাই শুধু গল্প-কবিতা লেখে বলেই ওর ধারণা ছিল, সে-যে আবার গান্ধিজিকেও দেখতে পারে—এটা অভাবনীয় কাণ্ড!

গান্ধিজির সেই প্রার্থনাসভা আমার যেমন মনে আছে, তেমনিই মনে আছে আর-একটা দিন। সেদিন হঠাৎ দেখি আমার মা তাঁর আটপৌরে শাড়িটা পরেই খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মা কখনও অমনধারা আটপৌরে শাড়ি পরে বেরোন না। আর ঘরেও চটি পায়ে দেন। ব্যাপার কী? কাণ্ড দেখে আমিও ছুটি।

'মা, মা, কোথায় যাচ্ছ? খালি পায়ে?'

মা বললেন, 'এই-তো সামনে, তুইও আয়, জুতোটা খুলে আয়।'

জুতো ছুঁড়ে ফেলে আমি দৌড়ে মার সঙ্গে যাই। রাসবিহারী এভিনিউতে পৌঁছনোর আগেই দেখি মস্ত এক মিছিল চলেছে—এত মানুষ, একটা টু-শব্দ নেই! মৌন মিছিল। শোকযাত্রা।

মা বোধহয় হঠাৎ বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেছেন। মার চোখভরা জল—খালি পা—মিছিলে অন্যদেরও চোখে অশ্রু টলটল করছে। আমি ছোট মেয়ে, আমার মনে খুব কষ্ট হল।

কতক্ষণ সেই মিছিলের সঙ্গে হেঁটেছিলুম, আমার মনে নেই। মা রুগ্ন মানুষ ছিলেন, হাঁটতে পারতেন না বেশিক্ষণ। পরে শুনলুম সেদিন দিল্লিতে বিড়লাদের বাড়ির প্রার্থনাসভায় তাঁকে নমস্কার জানানোর ছলে খুব কাছে গিয়ে এক মারাঠি যুবক—তার নাম নাথুরাম গড্‌সে—গান্ধিজিকে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করেছে। মায়ের শোক প্রত্যক্ষ দেখিনি আগে কোনওদিন—তাই ছোট হলেও বুঝতে পারলুম যে, খুব জরুরি একজন মানুষ, খুব কাছের একজন মানুষকে, আজ হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

এখন ৩০ জানুয়ারি তারিখে গান্ধিজিকে যেমন মনে পড়ে যায়, মনকেমন করে ওঠে, মার জন্যেও তেমনি মনকেমন করে আমার।

নামাঙ্কন : দেবাশিস দেব। অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

রান্না বান্না

রাজশ্রী রাহা

মারী বিস্কুট কিনে এনেছেন মা। রিম্পির ভালো লাগে না, তবুও। বিস্কুট চাইলেই, মা এগিয়ে দিচ্ছেন ওই মারী বিস্কুট। না-খেলেও, অন্য বিস্কুট আনছেন না। রিম্পি সেদিন বাবার কাছে চুপিচুপি ক্রিম বিস্কুটের আব্দার করছিল। বাবা রাজি-ও হলেন, মা হঠাৎ এসে বললেন, 'একদম না। ক্রিম বিস্কুট খেতেই দেব না।'

বাবা জানতে চাইলেন, 'কেন?'

মা বললেন, 'ক্রিম যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আর দেখতে হবে না!'

ততক্ষণে রিম্পি কাঁদতে শুরু করেছে। ক্রিম বিস্কুট তো খাওয়া হলই না, এখন বকুনি খাও।

বাবা রিম্পিকে কাছে টেনে নিলেন।

'দেখেছ, মেয়েটা কেঁদে ফেলেছে। নামী কোম্পানি...'

বাবার মুখের কথা কেড়ে নিলেন মা।

'ভুল প্যাকেজিং হলে নামী কোম্পানির চকলেটেও পোকা বেরোয়।'

বলতে বলতে মা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

বাবা সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইউরেকা! চল, আমরা ক্রিম বিস্কুট বানিয়ে ফেলি।'

রিম্পি অবাক হয়ে তাকায়, 'বাড়িতে? কীভাবে?'

বাবা রিম্পির পিঠে ছোট্ট একটা চাঁটি মারলেন।

'চল না।'

বাবা নিলেন—দু'-চামচ মাখন, গুঁড়ো চিনি এক চামচ, আধ চামচ ড্রিঙ্কিং চকোলেট গুঁড়ো, কাজু কুচোনো আর কিসমিস একটু। সব জোগাড় করে বিজয়ীর হাসি হাসলেন।

'তোর মাকে আজ হারিয়ে দেব।'

রিম্পি চোখের জল মুছে হাসিমুখে বলল, 'আমি কী করব?'

'এগুলো ভালোভাবে মেশা।'

তারপর গ্যাসের ওপর তাওয়া গরম করে পাত্রটা তাওয়ার ওপর বসিয়ে, একটু নেড়েই নামিয়ে নিলেন বাবা। মা ততক্ষণে রাগ করে ব্যালকনিতে।

বাবা এবার কৌটো খুলে মারী বিস্কুট বার করলেন। সেই মারী! রিম্পির চক্ষু চড়কগাছ!

বাবা রিম্পির হাতে চামচ দিয়ে বললেন, 'যে ক্রিমটা বানালাম, সেটা যত্ন করে এক-একটা বিস্কুটে মাখা। তারপর অন্য-একটা বিস্কুট চাপা দে।'

রিম্পি ভাবল—বেশ মজা তো!

বানিয়ে বানিয়ে ক্রিম বিস্কুট রেকাবির ওপর সাজানো হল। কয়েকটা হয়ে যাওয়ার পর বাবা রেকাবিটা ফ্রিজে ভরে দিলেন।

মিনিট সাতেক পরে বার করে, সাধাসাধি করে মা-কে যখন খাওয়ানো হল, মায়ের চোখে জল, মুখে হাসি।

রিম্পি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'হুর্‌রে!'

নামাঙ্কন : সৌমিত্র সোম

অলঙ্করণ : সমীর সরকার

ক্রসিং

রঞ্জন প্রসাদ

কাচের বাইরে শীর্ণ মেয়ে
বুভুক্ষু হাত বাড়ায়—
কাচের ভিতর স্টিরিও-ঝড়
মাইকেল জ্যাকসন।
তরুণী মুখ অধৈর্য হয়
নিলয়-নিশির ডাকে
লালবাতিতে মারুতি-জেন
থামবে কতক্ষণ...

অলঙ্করণ : নীতীশ মুখোপাধ্যায়

একই ফ্রেমে যাচ্ছে দেখা,
ভিন্ন দু'টি ছবি।
একজনে চায় একটা রুটি
এবং আরেক জন
অনেক কিছু থেকেও কখন
সব গিয়েছে চুরি!
চোরাবালির তলায় বিবেক
যাক-না বিসর্জন...

দুটো মেয়েই জন্মেছিল
একটা স্বাধীন দেশে
ঠিক একটা তো? সত্যি স্বাধীন?
মানতে চায় না মন!
বলতে পারো, কোন ক্রসিং-এ
নীলাম হয়ে গেল—
ছিন্নভিন্ন স্বদেশ আমার
সাত পুরুষের ধন?

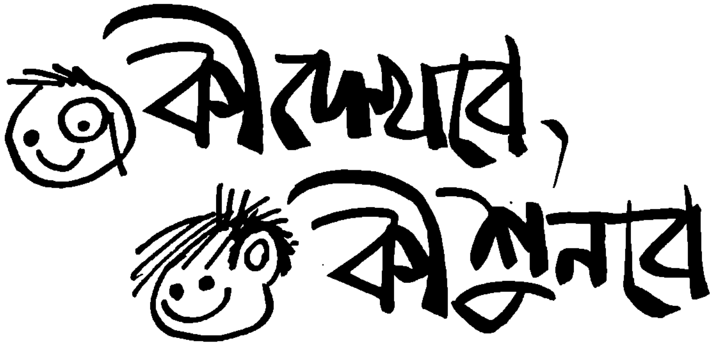

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

বাঙালির স্বপ্নের ঝরনা

গুপী গাইন বাঘা বাইন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি

সিনেমায় দেখা দিয়েই সমস্ত বাঙালিকে মাতিয়ে দিয়েছিল গুপী আর বাঘা। সে-এক অদ্ভুত কাণ্ড! ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল প্রচণ্ড গরমে। সেদিন ছিল পঁচিশে বৈশাখ, আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর আগে। বছরের ঠিক ওই সময়টা বাংলার অনেক ইস্কুলে ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা চলত। তা-সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক ভিড় সিনেমাহলে! শুধু কলকাতায় নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে। আর গরমের ছুটির পর ইস্কুলগুলো যেই খুলল, সে-এক তাজ্জব ব্যাপার! টিফিনের সময় ছেলেমেয়েরা ঘুরে-ঘুরে টিফিন খাচ্ছে, আর গলা ছেড়ে গাইছে গুপীর গান! শুনে শুনে মনে হতে লাগল—ছোটদের কোনও ছবি আর-কখনও বাঙালিদের মধ্যে এত জনপ্রিয় হয়নি।

ছোটদের বড়দের মিলিয়ে যত বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে, তাদের সবার মধ্যে যে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর জুড়ি মেলা ভার—সে-কথা অবশ্য প্রথম দু'-তিন মাসে টের পাওয়া যায়নি। এভাবে গরমের দিন কেটে গেল, বাদলার দিনগুলো এসে চলেও গেল, পাড়ায় পাড়ায় পুজোর ঢাক বেজে উঠল—তবু গুপী-বাঘার চলে যাবার নামটি নেই! গোটা বাংলা জুড়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলছে তো চলছেই! চলছে তো চলছেই!

এভাবে চলতে চলতে হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেল, মাসের পর মাস গড়িয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলল একটানা ১০০ সপ্তাহ! আর-কোনও বাংলা ছবি এতদিন চলেনি। গুপীর আগেও না, পরেও না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : ছবিটা এত জনপ্রিয় হল কেন? কেন সমস্ত বাঙালিবাড়ির সবাই মিলে—দাদু থেকে নাতি-পুতি পর্যন্ত—বার বার দেখল ছবিটা? ভিসিডি বা ডিভিডি চালিয়ে কেন আজও সবাই ছবিটা দেখেই চলেছে? এই-যে নতুন ঝকঝকে প্রিন্ট বানিয়ে ছবিটা আবার হৈহৈ করে মুক্তি পেল কলকাতায়—নানান ছবিঘরে ভিড় উপচে পড়ছে কেন? এসো, এর উত্তর ভাবার চেষ্টা করি। হাজারটা কারণ ভেবে ভেবে বের করা যায়। আমি দু'-একটা কারণ বলছি। তোমাদের নিজস্ব কারণগুলো চিঠি লিখে 'সন্দেশ'-এ জানিয়ে দিও।

প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের আলাদা আলাদা স্বপ্ন থাকে। যেমন ধরো সাহেবদের—মানে ইংল্যান্ডের লোকেদের—যে স্বপ্ন, তার সঙ্গে বাঙালিদের স্বপ্ন মিলবে না। স্বপ্নটা আসে কোত্থেকে? অভাব থেকে। যার জীবনে যে-জিনিসটার সবচেয়ে অভাব, সেটা নিয়েই সে সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখে। যে-ছেলেটা ভালো ইস্কুলে ভর্তি হতে পারেনি, সে ভালো ইস্কুলে পড়ার স্বপ্ন দেখে। যে-মেয়েটার কাছে রঙিন ছবি-দেওয়া গল্পের বই নেই, সে গরমের ছুটিতে

খাটে শুয়ে রাশি রাশি গল্পের বই পড়ার স্বপ্ন দেখে। যেমন মরুভূমির লোকেরা বৃষ্টির স্বপ্ন দেখে। ঠিক তেমনই, বাঙালিরাও গত দুশো-আড়াইশো বছর ধরে কয়েকটা বিশেষ স্বপ্ন দেখেই চলেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন যেটা, সেই স্বপ্নটা হল খাওয়ার স্বপ্ন। এখানে ভাবতে ইচ্ছে করে—পৃথিবী-জুড়ে এত ভালো ভালো জিনিস থাকতে, হঠাৎ খাওয়ার স্বপ্ন এত বেশি করে দেখার দরকারটা কী?

এর উত্তর ভাবতে গেলে, আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। তখন বিলেত থেকে জাহাজে চড়ে বাংলায় এসে লাটসাহেব সেজে বসেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হাজার হলেও ভিনদেশি, তাই এ-দেশ শাসনের কাজে হেস্টিংস-এর আদৌ নজর ছিল না। তিনি সোরা, নুন আর চালের ব্যবসা নিয়েই মেতে থাকতেন। আর-কোনওদিকেই যে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না, সেটা তাঁর চিঠিপত্র পড়লেই দিব্যি টের পাওয়া যায়। অমনোযোগী আর খালি মুনাফায় আগ্রহী রাজা থাকলে দেশের যা ঘটে, তাই হল। দুর্ভিক্ষের দাপটে পোকামাকড়ের মতো মানুষ মারা যেতে লাগল গোটা বাংলা-জুড়ে। তারপর থেকে ইংরেজ আমলে আরও কতবার যে কত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সে-কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেই বোধহয় আমাদের দারুণ লজ্জা! তাই ইস্কুলের ইতিহাসের সিলেবাসে বাংলার নানা দুর্ভিক্ষের কথা তেমন করে পড়ানোও হয় না।

বাংলায় অনাহার তো লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে সেই অনাহারের বিস্ফোরণই হল দুর্ভিক্ষ। এমনকী ইংরেজরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার কিছুদিন আগে—১৯৪৩ সালে—গোটা বাংলা-জুড়ে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তৈরি করেছিল, যাতে বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ না-খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল কয়েক মাসে। সেই দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক বাঙালির মন থেকে আজও মোছেনি।

একটা জাতির মন থেকে এই ভয়গুলো সহজে মোছে না। দাদু-দিদা-ঠাকুমার মুখে শুনে-শুনে এই ভয়টা তোমাদের মধ্যেও বাসা বেঁধে আছে, সহজে হয়তো টের পাও না। আর শুধু ইংরেজ আমলে নয়, স্বাধীনতার পরেও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছে এই বাংলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছর-ত্রিশেক পরেও, স্বাধীন ভারতে ১৯৭৩ সালে কলকাতার রাস্তায়, শিয়ালদা আর হাওড়া স্টেশনে না-খেতে পেয়ে মরা মানুষের দেহ পড়ে থাকত!

১৯৪৩-এর এই দুর্ভিক্ষের কথা বাঙালি আজও ভোলেনি। ছবি : জয়নুল আবেদিন

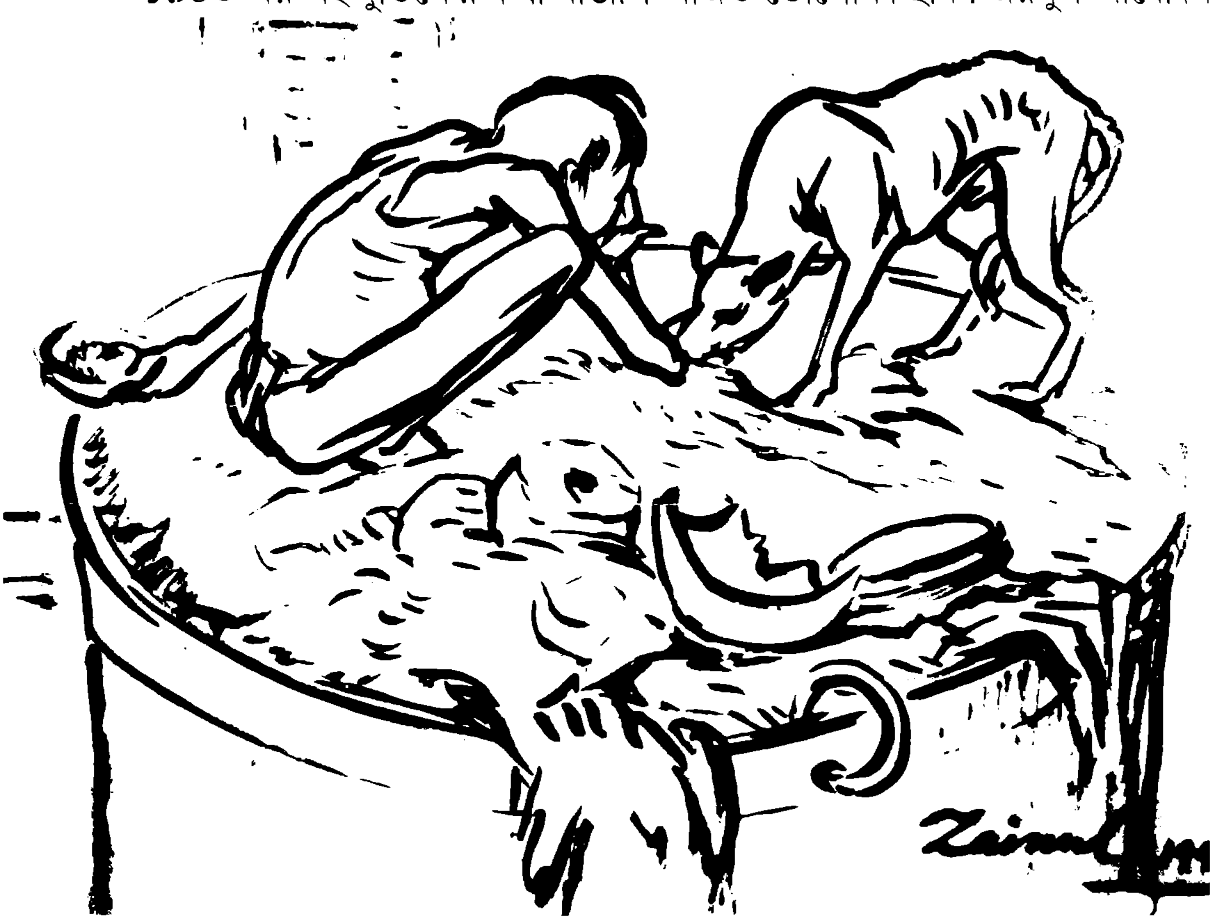

এ-রকমই তো বাঙালির ইতিহাস। তাই খাওয়ার স্বপ্নই-যে বাঙালি সবচেয়ে বেশি করে দেখবে, এতে আর আশ্চর্য কী!

তাই ভূতের রাজার কাছে বর চাওয়ার সময় গুপী আর বাঘা প্রথমেই খাওয়ার বর চেয়ে বসল। বাঙালি আবার কোনওদিনই 'খাওয়া' শব্দটাকে আলাদা ভাবতে পারে না। খাওয়ার সঙ্গে 'পরা' জুড়ে দেয়! যেমন খাওয়া-পরা। ভাত-কাপড়। তাই গুপী-বাঘা খাওয়া-পরার বর একসঙ্গেই চেয়ে বসল। এই দুটো যে আলাদা বর হতে পারে, সে-কথা স্বয়ং ভূতের রাজারও মাথায় আসেনি! ভূতের রাজা তো তিনের বেশি বর দেবেন বলে কথাই দেননি। কিন্তু ফাঁকতালে গুপী আর বাঘা চারখানা বর পেয়ে গেছে! খাওয়া আর পরা—এই দুটো শব্দ বাংলাভাষায় যেমন চট করে একসঙ্গে জুড়ে যায়, পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় বোধহয় এত সহজে এই শব্দ-দুটোকে পাশাপাশি বসানো চলে না। তাই গুপী যখন ভূতের রাজাকে বলল, 'আমাদের যেন খাওয়া-পরার কোনও ভাবনা না-থাকে...', অমনি ভূতের রাজা সেটাকে একটা গোটা বর হিসেবে মেনে নিলেন। আর বরটা দিয়েও দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সব বাঙালির মনে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটা চিরকালের মতো ঘাঁটি গেড়ে বসল। ভয়াবহ সব দুর্ভিক্ষের স্মৃতি নিয়ে যে-জাতি আজও বেঁচে আছে, সেই জাতি যে-ই দেখতে পায় তাদেরই

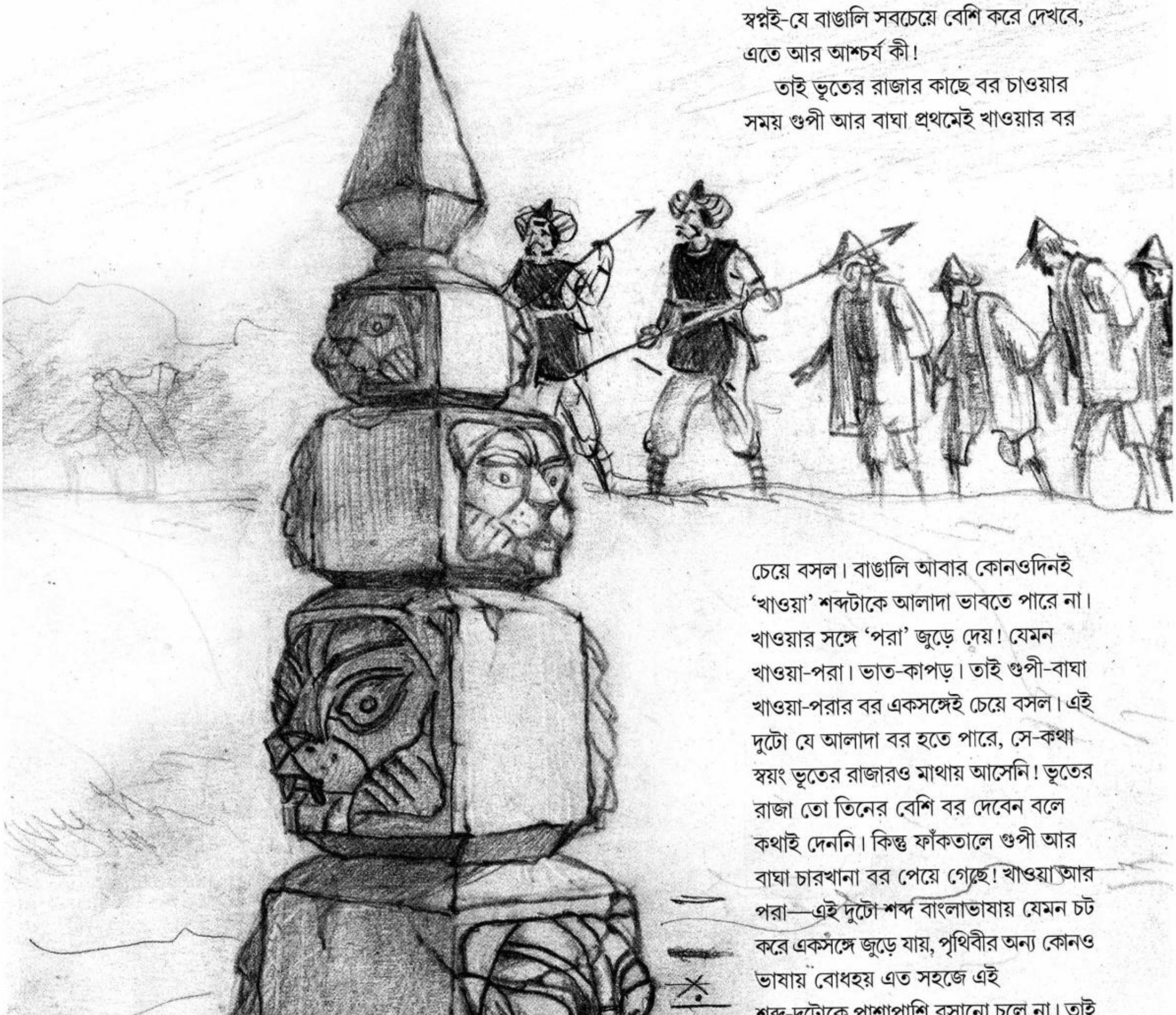

হাল্লার খেতে না-পাওয়া প্রজাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি : সত্যজিৎ রায়

ছবিটা আগে কোথাও ছাপা হয়নি।

একজনের খাওয়া-পরার সমস্যা চিরকালের মতো মিটে গেছে, অমনি সেই মানুষটাকে তারা ভালোবেসে ফেলে। তক্ষুনি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটাকে আমরা ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। শুধু ছবিটা আমাদের খুশি করেছিল বলেই নয়, ছবিটা আমাদের সবচেয়ে লুকনো স্বপ্নের কথা খোলাখুলি বলতে পেরেছিল বলে।

এরপরে আমরা সোজা তিন নম্বর বরের কথায় চলে আসতে পারি। প্রত্যেক বাঙালির মনেই শিল্পী হওয়ার একটা বাসনা থাকে। অনেকেই সেটা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ভূতের রাজার বর পেয়ে আমাদের দুটো গাঁয়ের ছেলে চোখের

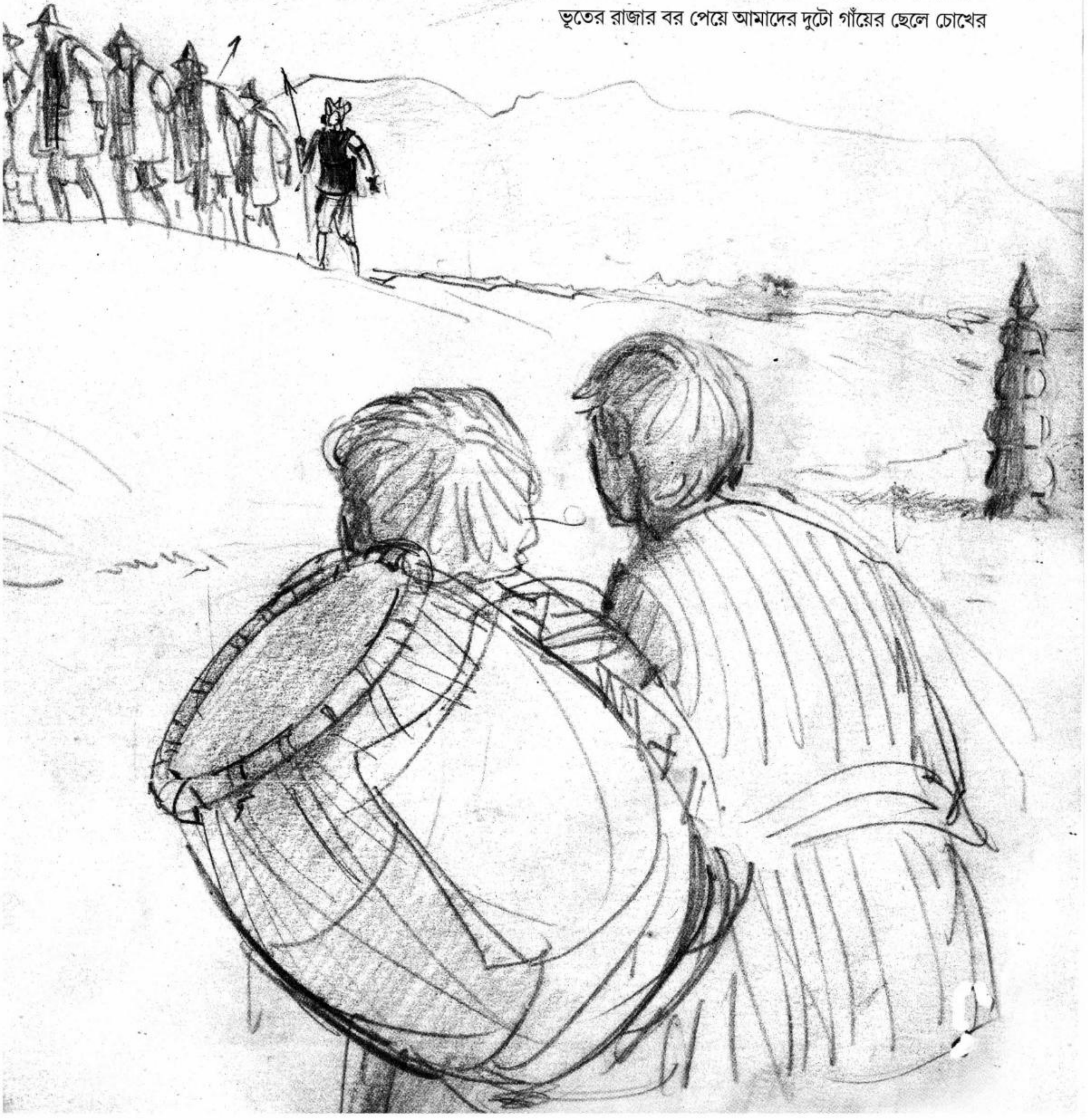

সামনে দিব্যি শিল্পী হয়ে উঠল! এখানেই প্রত্যেক বাঙালির আর-একটা গোপন স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলল এই সিনেমা।

এখানে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা কোনও একজন লোকের স্বপ্ন নয়। এই দুটো স্বপ্নই সমস্ত বাঙালি জাতির স্বপ্ন। তার মানে, ব্যক্তিগত স্বপ্ন নয়, বলা যেতে পারে জাতিগত স্বপ্ন। যে-শিল্পসৃষ্টি জাতিগত স্বপ্নকে ছুঁয়ে যায়, সেই সৃষ্টিকে মানুষ কোনওদিন ভুলতে পারে না।

বাঙালির আর-একটা বড় বৈশিষ্ট্য—বাংলাভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, সব জাতিই তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। বাঙালি কি তার মাতৃভাষাকে আর-একটু বেশি ভালোবাসে? হয়তো তাই। তার একটা বড় কারণ—এই বাংলায় নানা সময় ভিনদেশি নানা জাতি হামলা করতে এসেছে। আবার কখনও শুধুই ব্যবসা করতে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে পড়েছে, আর কখনও ফিরে যায়নি। এরকম হামলা করে জমি কেড়ে নেওয়া কিংবা ব্যবসা করতে এসে ফিরে না-যাওয়া নানা জাতির লোকেদের হাতে বাঙালি যেমন মার খেয়েছে, আবার ঠকেওছে। অর্থাৎ, জমি-খাদ্য মান-সম্মান সব কিছুই নানাসময় ভিনদেশিদের কাছে খুইয়েছে বাঙালি। কিন্তু বাঙালির মুখের ভাষাটা ভিনদেশিরা কেড়ে নিতে পারেনি। তাই বাঙালি যত বেশি করে বিদেশিদের কাছে হার মেনেছে, ততই নিজের ভাষাকে আরও ভালোবাসতে শিখেছে। তাই শুণ্ডি রাজসভায় গুপী যখন গেয়ে ওঠে—

'মহারাজা, তোমারে সেলাম
মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম
মোরা সাদাসিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই...'

সেই মুহূর্তে বাঙালি দর্শকদের মনটা নেচে ওঠে। বাঙালি বরাবরই নিজেকে সাদাসিধা মাটির মানুষ ভেবে এসেছে, নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষাকে তেমন ভালোবাসতেও পারেনি। অমনি আবার বাঙালির মনের গোপন ভালোবাসার জায়গাটা সহজেই ছুঁয়ে ফেলল 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'।

তবে এই সিনেমাটার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে—সমস্ত সমস্যাই সমাধান করা হচ্ছে গান গেয়ে। ছবির সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে এই ব্যাপারটাই দর্শকদের সবচেয়ে বেশি মনে ধরেছিল। কিন্তু কেন? এই-যে গান শুনিয়ে সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া বা যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া—বাঙালির ইতিহাসে এরকম কোনও ঘটনা কি আগে ঘটেছিল? শুধু গান গেয়েই কি বাঙালি কখনও বিরাট একটা ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা থামিয়ে দিতে পেরেছিল?

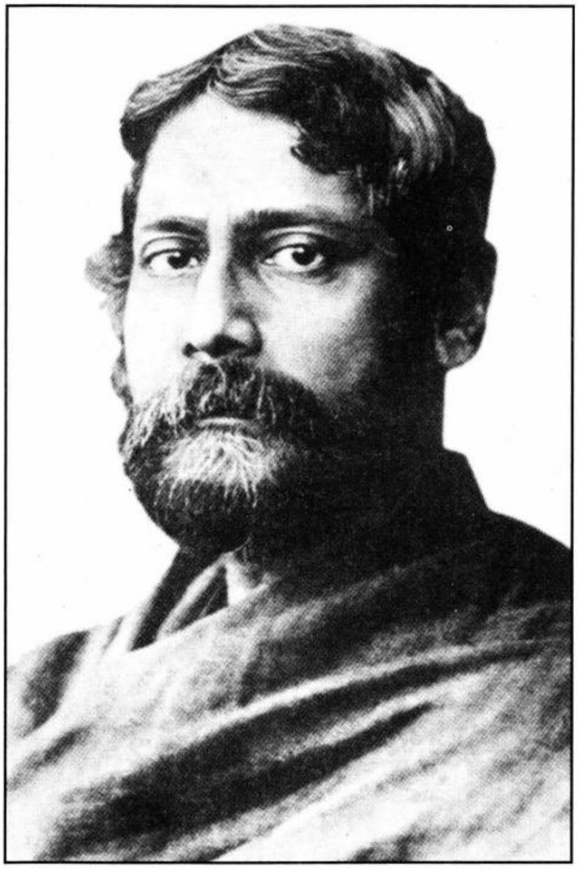

এই রবীন্দ্রনাথই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী মিছিলের সামনে হেঁটে গান গেয়েছিলেন।
আলোকচিত্র : সুকুমার রায়

ঠিক যেমন গুপী আর বাঘা শুধুই গান-বাজনার জোরে বিরাট একটা যুদ্ধ থামিয়ে দিল এই ছবিতে?

এই প্রশ্ন ওঠামাত্রই আমাদের মনটা চলে যাচ্ছে আজ থেকে ঠিক ১০১ বছর পেছনে। সে-বছর ইংরেজ বড়লাট লর্ড কার্জন আমাদের বাংলাদেশকে ভেঙে দু'-টুকরো করার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন। সেটা ছিল এক বিরাট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সাত সমুদ্র দূরে বিলেতে বসে এই সিদ্ধান্তে সই করা হয়েছিল। তখন আমরা ইংরেজদের অধীন। কাজেই, তখন-যে আমরা নিজেদের সৈন্যদল গড়ে জাহাজে চড়ে বিলেতে গিয়ে হামলা করব, আর বাংলা ভাগ করা আটকে দেব—একটা আট বছরের শিশুও সেই কথা কোনওদিন ভুলেও ভাববে না। কারণ, সেটা অবাস্তব।

কিন্তু বাঙালি তার চেয়েও অবাস্তব একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। বাংলাদেশকে কেটে দু'-টুকরো করে দেওয়া হবে, এ-কথা যেই লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন, অমনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে পর পর ২৫-২৬টা গান লিখে ফেললেন। আর দেখতে-না-দেখতে গানগুলো পথেঘাটে বাঙালির মুখে মুখে ফিরতে লাগল। বাংলা দু'-টুকরো হওয়ার কথা ছিল ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর। সেদিন ভোর থেকে এক অদ্ভুত কাণ্ড! হাজার হাজার বাঙালি কাতারে কাতারে গঙ্গাতীরে এসে জমা হতে লাগল। হিন্দু-মুসলমানরা পরস্পরকে রাখি পরিয়ে দিল। হাজার হাজার লোকের এই বিরাট মিছিল কিন্তু নীরব ছিল না। তবে কি তারা স্লোগান দিচ্ছিল? না, তা-ও নয়। তারা সবাই মিলে গলা মিলিয়ে গান গাইছিল। রবীন্দ্রনাথের গান। 'বাংলার মাটি বাংলার জল...'। আর এই গানের জাদুতে রাস্তায় মোতায়েন-থাকা ইংরেজদের যত পুলিশ, সবাই থমকে রইল। শোনা যায়, প্রায় এক লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন এই মিছিলে। কিন্তু তাই বলে কোথাও কোনও ভাঙচুর হয়নি, লুঠতরাজ হয়নি, মারামারি তো দূরের কথা! তাই পুলিশ আর কী করবে—পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই গান শুনল। গানের মিছিলের একেবারে সামনে হেঁটেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

এই গানের মিছিল বৃথা যায়নি। কিছুদিন পরেই বাংলা কেটে ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিয়েছিল ইংরেজ সরকার। এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই বাঙালি শিখেছিল—সবসময় অস্ত্র নয়, কখনও কখনও শুধু গান গেয়েও বিরাট রাজনৈতিক অনাচার আটকে ফেলা যায়। আর এই ঘটনাটা বাঙালির মনে চিরকালের মতো গেঁথে গেছে।

তাই গুপী আর বাঘা যখন শুধুই গান গেয়ে হাল্লারাজার বিরাট সৈন্যদলকে থামিয়ে দিল, সেই দৃশ্য দেখে বাঙালি জাতির গান গেয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। বাঙালির সবচেয়ে বড় যে-ক'টা স্বপ্ন আছে, গান গেয়ে বাংলা ভাগ আটকে দেওয়া তার মধ্যে একটা।

আর গুপীর গান শুনে চারপাশে যে সবাই পাথর হয়ে যায়, তারও কি কোনও ঐতিহাসিক নজির আছে? হ্যাঁ, তাও পাওয়া যাবে। তোমরা সবাই তো চারণকবি মুকুন্দ দাসের নাম শুনেছ। ইনিও বঙ্গভঙ্গের সময়েরই কবি। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ইনি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে-ফিরে একা-একাই গান গেয়ে বেড়াতেন। নিজের লেখা গান, নিজেরই সুরে গাওয়া—

'বান এসেছে মরা গাঙে
ধরতে হবে নাও
তোমরা এখনও ঘুমাও
তোমরা এখনও ঘুমাও...'

কী মনমাতানো সুর এই গানের! আজ ১০০ বছর পরে শুনলেও রক্ত নেচে ওঠে! যেখানেই তিনি গাইতে যেতেন, আশপাশের গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়ত। শোনা গেছে, তাঁর গান শুনতে শুনতে শ্রোতারা অনেকসময় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এই-যে গানের মাঝখানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, এটাও তো আসলে গান শুনে পাথর হয়ে যাবারই মতো। সুতরাং, এখানেও 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে ভালোবাসার, সবচেয়ে গর্ব করার মতো আর-একটা ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়।

এরকম আরও কতভাবে যে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমাটা বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে ভালোবাসার স্বপ্নগুলোকে ছুঁয়ে গেছে, তা বোধহয় লিখে শেষ করা যাবে না। তোমরা নিজেরাও 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আবার দেখে ভেবে ভেবে বার করতে পারো বাংলার ইতিহাসের আর কী কী ঘটনা তোমাদের মনে পড়ে যায় ছবিটা দেখতে দেখতে।

আমি শুধু আর-একটা ছোট্ট ঘটনা বলে আজকের মতো শেষ করছি।

এই ছবিতে আমরা দুই রাজাকে দেখি—শুণ্ডি আর হাল্লা। যমজ দুই ভাই দুই দেশের রাজা। ফলে শেষ পর্যন্ত যখন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ থেমে যায়, দুই রাজা মুখোমুখি এসে বসেন, তখন আমরা দেখতে পাই দু'জনেরই মুখ হুবহু একরকম। আর ঠিক এইখানেই আমাদের বাংলা ১৯৪৭ সালে ভাগ হয়ে দুটো দেশ তৈরি হওয়ার দুঃখের কথাটা মনে পড়ে যায়।

যদি আজও দুই বাংলা খুব কাছাকাছি এসে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব দুই বাংলার মুখই হুবহু এক। এটা আমরা জানি, বিশ্বাসও করি। শুধু মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না। কারণ, দেশটাকে চিরকালের মতো কেটে দু'-টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। তবু আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর স্বপ্নটা রয়েই যায়।

তাই যমজ দুই রাজা যখনই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করেন, অমনি আমাদের প্রাণ ভরে যায়। অমনি আমাদের মনে দুই বাংলা জোড়া-লাগার ভুলে-যাওয়া পুরনো স্বপ্নটা আবার জেগে ওঠে।

নামাঙ্কন : চণ্ডী লাহিড়ি
অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়

ছবির মজা

অমল চক্রবর্তী

লীলা মজুমদার অলঙ্করণ : সমীর সরকার

আঁকিবুঁকি

এখান থেকে নাকি মন্দির উঠিয়ে দেবে। তাই শুনে পুরুত রেগে টং।
বড়রাস্তার ধারে একটুখানি জায়গা, তাতে মান্ধাতার আমলের বটগাছের গোড়ায় দুটো পাথর ফেলে, তার ওপর সিঁদূর মাখিয়ে আরেকটা কালো লম্বাটে গোল পাথর ফেলে যদি বসে থাকা যায়, আর লোকেরা না-চাইতেই দুটো-একটা পয়সা ফেলে দেয়, তাতে কার কী ক্ষতিটা হচ্ছে শুনি? বলে নাকি তুলে দেবে! ফুট চওড়া হবে, গাছ কাটা হবে।

নাকি মান্ধাতার আমলের গাছ, এই পড়ে তো সেই পড়ে! পড়বি তো পড়, কারও ঘাড়ে পলেই হয়ে গেল! তাই কেটে ফেলবে। কাঠটাও বিক্রি হবে, আজকালকার মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে তাও কিছু কম কথা নয়।

গাছের কোটরে পুরুতের ঘরকন্না। ক'টা টিন, দুটো মাটির হাঁড়ি, ক'টা চট, একটা তুলোর কম্বল—ছেঁড়াখোঁড়া বটে, কিন্তু তকতকে পরিষ্কার। পুরুত গির্জার পাশের পুকুরে কেচে নেয়, চান সারে, জল তোলে। বেশ পুকুরটা! একধারে একটা নড়বড়ে পোস্তোতে সাইনবোট টানানো আছে: 'এখানে স্নান করা কাপড় কাচা নিষেধ।'

বেশ জায়গাটা। সাইনবোটের গোড়াতেই পুরুতের চানের জায়গা।

কালি, ভুলি, নটে, শম্ভু, শম্ভুর দুই বোন, চা-ওলা, জুতো-সেলাই, কাঠগুদোমের বেকার লোকটা, সবাই ভাগাভাগি করে মাথাপিছু আধ-ভাঁড় চায়ের তলানি খেয়ে চাঙা হয়ে বলল, 'তাহলে কোথাও চলে যেতে হয়।'

চা-ওলা বাকি চা-টুকু গলায় ঢেলে বলল, 'কিন্তু কোথায়?'

জুতো-সেলাইটা বড় ভিতু। সে বলল, 'এখানে ওখানে চট পেতে দিনে ছুঁচ-ফাল নিয়ে বসি, রাতে টিপিটুপি হয়ে শুয়ে থাকি, তাও রোজ উঠিয়ে দেয়। এ-সব ছেড়ে কোথায় যাব?'

বেকার লোকটা বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। আমার চালচুলো নেই, স্বচ্ছন্দে সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারি।'

ছেলেমেয়েগুলো এক বাক্যে বলল, 'হ্যাঁ, চলেই যাই। নইলে ধরে পাঠশালে দেবে।'

চা-ওলা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'যাওয়াই ভালো। কী এমন আছে যে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে?'

ছেলেমেয়েগুলো একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমরাও, আমরাও। আমাদেরও কিছু নেই। আমরাও সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব।'

চা-ওলা চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'শহরটা কিন্তু বেড়ে জায়গা। সব আছে এখানে। এখানে ফকির এসে রাজা হয়ে যায়। খালি তিনটে জিনিস নেই। থাকার জায়গা, পেটের খাবার, পরনের কাপড়। নাঃ, চলো পুরুত, চলেই যাই।'

কালি ভুলি নটে শম্ভু বলল, 'কেন, ওগুলো কি খুব দরকারি জিনিস? আমরা তো কোনওকালেও ও-সব পাই না। ও পুরুত, চলো তাহলে।'

পুরুত যেন ঘুম থেকে জেগে শম্ভুর বোন দুটোকে দেখিয়ে বলল, 'ওরা তো হাঁটতে পারে না, ওরা যাবে কী করে?'

শুনে শম্ভু অবাক।

'কেন, পিঠে করে নিয়ে যাব। মা-বাবা পালিয়ে গেছে, ওরা কি কখনও একলা থাকতে পারে?' বলে ওদের নোংরা গালে চুমো খেল। ওরা ওর নাক-কান ধরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'আছে একটা জায়গা। কিন্তু সে তোদের পোষাবে কি?'

বেকার লোকটা বলল, 'কেন পোষাবে না শুনি?'

পুরুত বলল, 'সেখানে যে আর কিছুই নেই। খালি ওই তিনটেই আছে।'

অমনি ওরা সবাই উঠে পড়ল, 'চলো চলো চলো চলো।'

পুরুত বলল, 'সেখানে হোটেল নেই, পাতকুড়ুনি পাবিনে!'

ছেলেমেয়েগুলো বলল, 'এখানেও পাই না। কুকুর-বেড়ালরা সব খেয়ে ফেলে।'

পুরুত বলল, 'সিনেমা নেই।'

ওরা বলল, 'অন্য জিনিসের দেয়ালে ঠেস দেব।'

'ট্রাম-বাস নেই, বিজলি বাতি নেই, দোকানপাট নেই।'

ওরা হো-হো করে হাসতে লাগল, 'কোথায় পয়সা পাব যে ও-সব দেখব! ও-সব আমাদের দরকার নেই। পাঠশালি না-থাকলেই হল।'

'চাটওয়ালাও নেই।'

ওরা একবার এ-ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের কান মলে দেয়। ফাটকে দেবে বলে। না পুরুত, তুমি আমাদের নিয়ে চলো। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'মুনসিপালের মিনিমাগনার পাঠশালা নেই তো?'

পুরুত রেগে গেল।

'বলছি কিচ্ছু নেই, ওই তিনটে ছাড়া।'

'তবে চলো, তবে চলো, তবে চলো।'

পুরুত অমনি উঠে পড়ে বলে, 'চলো।' বলে কোটর থেকে চট-কম্বল কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়।

জুতো-সেলাই তো অবাক।

'ও কী! ঠাকুর নেবে না?'

'দূর, ঠাকুর সেখানে হেঁটে বেড়ায়। গায়ের জাব্বা-জোব্বার শব্দ শোনা যায়—খস-খস-খস।'

কালি ভুলি বলল, 'অ্যাঁ! জোব্বা পরে নাকি? কই, আমাদের তো জোব্বা নেই! থেটারের রাজার আছে। কী সুন্দর!'

বেকার লোকটা বলল, 'তোমরা কি ঠাকুর? আহা, বড় গির্জের পাদরির কাছে কী সুন্দর ছবি দেখলাম—নীল জোব্বা গায়ে, মেঘের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে ঠাকুর বসে আছে। এই অ্যাত্ত বড় দাড়ি, মাথায় খোঁচা-খোঁচা মুটুক!'

'কেন? খোঁচা-খোঁচা মুটুক কেন?'

'তা পাদরি বলল—নাকি আলোর মুটুক। তবে কেউ নাকি চোখে দেখতে পায় না।'

'ও মা! তবে মুটুক পরে লাভটা কী?'

নটে বলল, 'দুগ্‌গো ঠাকুরের মাথায় সোলার মুটুকে রাংতা মোড়া। কী সুন্দর! সবাই দেখতে পায়।'

পুরুত এক পা বাড়িয়ে বলল, 'সুন্দর না ছাই! খালের জলে যেই-না পল, সব রঙ ধুয়ে সাবাড়! যাকে চোখে দেখা যায় না, তার জিনিসও নষ্ট হয় না। নাও, চলো।'

কালি ভুলি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও কী! তোমার কালো গোল ঠাকুর সত্যি নিলে না, পুরুত? ওর দেখাশুনো কে করবে? কে ধূপকাটি জ্বালাবে, গঙ্গাজল ছিটুবে, বাতাসা খেতে দেবে?'

শম্ভুর বোন দুটো অমনি নোংরা নোংরা হাত পেতে বলল, 'দে লে!'

পুরুত বাতাসার কৌটো খালি করে সবার হাতে হাতে বাতাসা দিয়ে দিল। ধূপকাটি সব একসঙ্গে জ্বেলে মাটির দলায় গুঁজে দিয়ে, গঙ্গাজলের সবটি কালো গোল পাথরের গায়ে ঢেলে বলল, 'চলো তাহলে।'

অমনি সবাই রওনা হয়ে গেল, বড় বড় পা ফেলে, দুলে দুলে। তাহলে হাঁপ ধরে না। আরও এগিয়ে, যতদূর পারা যায়, পাঠশালা থেকে যতদূর যাওয়া যায়।

ছোকরা বাবুরা নাকি ছেলেমেয়ে ধরে ধরে মুনসিপালের পাঠশালে ভরে দেয়! আর এ-জন্মে ছাড়া পায় না!

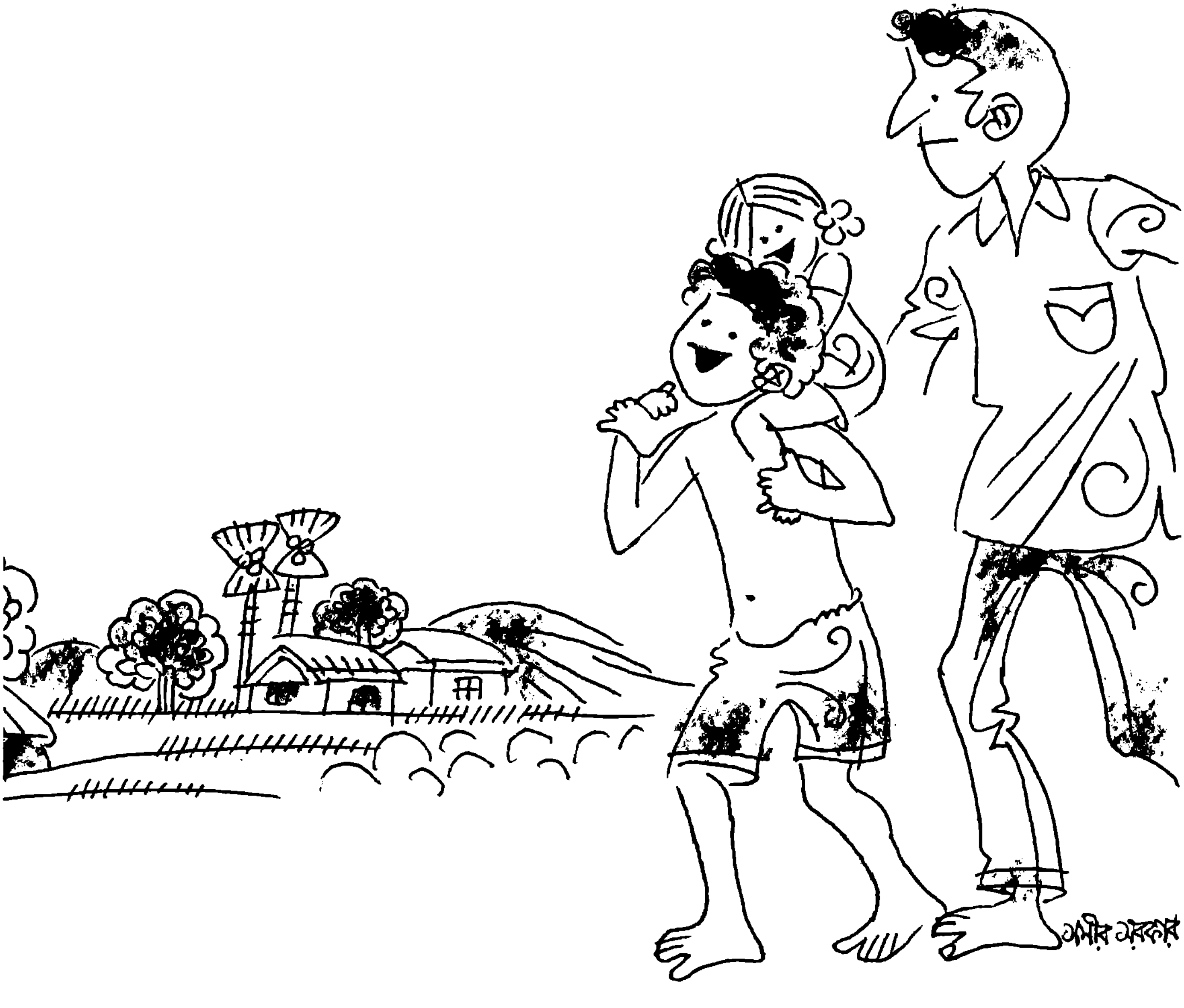

কালি ভুলি আগে চলল, তাদের আগে কম্বল-কাঁধে পুরুত। তাদের পেছনে শম্ভু, তার কাঁধে একটা বোন। তার পেছনে নটে, তার কাঁধে আরেকটা বোন। সবার পেছনে উনুন-বাক্স হাতে নিয়ে চা-ওলা, তারপর জুতো-সেলাই আর কাঠগুদোমের বেকার লোকটা। পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ে, কথায় কথায় পথ পার হয়ে যায়।

ওরা অবাক হয়ে দেখে কিনা শহর ছেড়ে আধঘণ্টা হাঁটলেই অমনি পাড়া-গাঁ। দু'-দিকে ধানখেত, মধ্যিখানে সড়ক! এ-দিকের ধানখেত থেকে ও-দিকের ধানখেতে জল যাবার নালা, তার ওপর ছোট্ট পুল। পুলের ওপর একটা মা-ছাগল আর দুটো ছাগলছানা নিয়ে এক বুড়ি বসে। বুড়ির চোখে জল।

সে সব কথা শুনে বলল, 'আমিও যাব। নইলে ছেলেপুলেদের ছাগল-দুধ কে খাওয়াবে? তাছাড়া বউ ঠ্যাঙার বাড়ি মেরে তেড়িয়ে দিয়েছে, যাবটাই-বা কোন চুলোয়?'

পুরুত বলল, 'তবে চলো।'

কিছুদূর গিয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করল, 'তা যাওয়া হচ্ছেটা কোথায়?'

ওরা বলল, 'যেখানে তিনটে জিনিস পাওয়া যায়।'

'কোন তিনটে জিনিস?'

ওরা বলল, 'থাকার চালা, পেটের খাবার, পরনের কাপড়।'

শুনে বুড়ির কী হাসি!

'দুৎ! অমন জায়গা থাকে নাকি আবার?'

'আছে, আছে। চলো আমাদের সঙ্গে।'

'সে কোথায়? সত্যি ও-সব সগ্‌গ ছাড়া কোথাও আছে নাকি?'

পুরুত বলল, 'আছে। যা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না, সেই সব সেখানে আছে। আলো, বাতাস, জল, ফল, শকর-কন্দ।'

বুড়িও বলল, 'চলো তাহলে। কিন্তু তেড়িয়ে দেবে না তো?'

'কেউ নেই তো তাড়াবেটা কে? সে আমার বুড়ো ঠাকুরদাদার স্বপ্ন দেখার দেশ। তবে কিছু কাঁকড়াবিছের উৎপাত আছে, তাই ওমিওপ্যাথির শিশিটে নিয়েছি।'

বেকার লোকটা বলল, 'তাছাড়া গ্যাঁদাফুলের পাতা বেটে মাখিয়ে দিলেও সব দুঃখু দূর হয়।'

জুতো-সেলাইও কম যায় না। সে বলল, 'হাড়ভাঙা পাতা ছেঁচে লাগালেও জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়।'

'সে-সবই সেখানে গাছতলায় গজায়। ঠাকুরদাদারা যেমন সব ফেলে এসেছিল, তেমনি আছে।'

সারাদিন ওরা হাঁটল।

দুপুরে গাবতলায় থেমে পেট ভরে গাব খেল। সন্ধ্যার ঠিক আগে বুড়ো ঠাকুরদাদাদের স্বপ্নে দেখা সেই জায়গায় পৌঁছল।

জায়গা তো নয়, একটা পাহাড়। পাহাড়ও নয়, বরং একটা উঁচু ঢিবি। আগাগোড়া ঘন বনে ঢাকা! বনের তলা দিয়ে শুকনো পাতা বিছানো অনেকদিন না-চলা এক পথ। তাই দিয়ে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে দেখে যেন সত্যি সগ্‌গে এসেছে! তাহলে বুড়ি তো ঠিকই বলেছিল।

খালি সবুজ গাছ আর লতা আর ফুলের গন্ধ আর থোপা থোপা পাকা ফল রসে টুপ-টুপ করছে। ছোট ছোট ঝরনা মাটি থেকে বুগ-বুগ করে উঠে কুল-কুল করে নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে। তারি ধারে ধারে বড় বড় পাথরে ঝরঝরে সব গুহা—পায়ের নীচে বালি, দেয়ালে কারা গেরিমাটি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে। হরিণ ছুটছে, শিকারি ধনুক তুলেছে, বাজপাখি উড়ছে, এইসব।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে ওরা অবাক।

'কারা এমন ভালো জায়গা ছেড়ে চলে গেছিল, পুরুত? কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, আস্তাকুঁড় নেই দেখেছ!'

পুরুত বলল, 'যারা গেছিল, তারা আমার ঠাকুরদাদের ঠাকুরদারা। তারা গেলে, ময়লা করবেটা কে শুনি? জন্তুজানোয়ার কখনও পরিষ্কার মাটি নোংরা করে?'

বুড়ি চেয়ে চেয়ে বলল, 'ওমা! লাল ধানের চাষ করেছিল গো! আম জাম কাঁঠাল কলা পুঁতেছিল! তুলোগাছ লাগিয়েছিল! গোরু ছাগল পেলেছিল! চারদিকে তার চিহ্ন পাচ্ছি। তা ছেড়ে গেল কেন?'

পুরুত অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আর থেকে হবেটা কী আমার মাথা-মুণ্ডু! খেতে পেল, শুতে পেল, পরতে পেল। তাই শেষটা টিকতে না-পেরে চলেও গেল।'

কালি ভুলি নটে শম্ভু শুনে অবাক। বোন দুটো ঘুমিয়ে কাদা। ছাগল তিনটে শেষ এক কোশ এর ওর কাঁধে চেপে এসেছিল, শুধু তারাই চুপ করে রইল।

তখন বাকিরা উঠে পড়ে মহা শোরগোল তুলল, 'তবে আমরাই-বা টিকব কেম্‌নে? আমরাও ফিরে যাই। পুরুত, তুমি ঠাকুর ফেলে এসে ভালো করোনি। এখানে আমাদের দেখবে কে?'

নটে বলল, 'বলেছিলে-যে এখানকার বনে ঠাকুর হাঁটে, কোথায় সে?'

অমনি কোথা থেকে এক দমকা বাতাস উঠতেই, সারা বন শিরশির সরসর করে উঠল! ফুলের গন্ধে চারদিক ভরল। ঘুমের ঘোরে পাখিরা বলল কুঁ-কুঁ বকম-বকম। সারা রাত জেগে পাখার বাতাস দিয়ে মৌমাছিরা মৌচাক ঠাণ্ডা করে, তারা বলল গুণ্‌ণ্‌ণ্‌ গুণ্‌ণ্‌ণ্‌। টুপ-টাপ করে দুটো চারটে ফুল ফল ঝরে ওদের গায়ে পড়ল। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলল।

আর কারও মুখে কথা নেই। বুড়ি চা-ওলার টিনে ছাগল দুইয়ে ওদের দুধ খাওয়াল। তারপর ফল খেয়ে, নদীতে মুখ-হাত ধুয়ে, গুহার বালিতে পাতা পেতে যে-যার সে-রাতের মতো ঘুমিয়ে রইল।

সকালে পুরুত বলল, 'চান করে সব সাফ হ্‌। বনের গাছতলা তকতক করছে, পাতায় পাতায় কে-যেন পালিশ লাগিয়েছে! বেকার যুবক, তুমি কাঠ চিরে তাঁত আর চরকা বানাবে। জুতো-সেলাই, তুমি কার্পাস তুলে সুতো কাটবে। বাকিরা কাপড় বুনবে। সবাই মিলে ধান তুলবে, শস্য তুলবে। সবাই গুহায় শোবে। আবার কী চাই?'

ওরা লাফিয়ে উঠে বলল, 'কিছু না, কিছু না। পাঠশাল নেই—কী মজা! কী মজা!'

ওরা চান সেরে এলে পুরুত বলল, 'কিন্তু সবার আগে একটা কথা।' বলে কাঠি দিয়ে মাটিতে একটা বাঁকা দাগের পাশে একটা দো-ঠেঙো সোজা দাগ কেটে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

কালি বলল, 'উল্টে পড়া কচ্ছপের ছানা, পাশে একটা ঘাস।'

তুলি বলল, 'উল্টোনো খেজুরের রসের হাঁড়ি, পাশে পেঁপের বোঁটা।'

শম্ভু বলল, 'গুগলির পাশে ঘাস।'

পুরুত একটু কী-যেন ভেবে বলল, 'আচ্ছা, ওই থেকে তোরা কাঠি দিয়ে আঁক।'

সারি সারি আঁকা হলে পুরুত বলল, 'আচ্ছা, তার পাশে আরেকটা ফ্যাকড়া কাঠি দে দিকি। ঠেকা দিয়ে থাকুক। পাঁচটা করে আঁক দিকি।'

তাই আঁকল ওরা। নটে অনেকগুলো আঁকল।

তারপর পুরুত বলল, 'দ্যাখ গে, বারোমেসে আমগাছে আম হল কিনা। আবার কাল নক্সা আঁকা। সাপের পরিবার।'

ওরা চলে গেলে বুড়ি এসে অনেক দেখে-শুনে বলল, 'ও পুরুত, নেকাপড়া নয়তো?'

পুরুত বলল, 'ও-গুলো তাই কখনও করে? ওই দিয়ে ওদের অস্তর হবে। দাও, আমাকে নারকেলের মালা করে ছাগলের দুধ দাও।'

ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মঙ্গলের জীবের পৃথিবী অভিযান

গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে সেই ছোট্ট জায়গা। ভারী সুন্দর। রঙবেরঙের ফুলে ভরা। পাপড়িগুলোর রঙের টানে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ ওই প্রত্যন্ত উপত্যকায় ভিড় জমায়। সেভাবে ফ্রাঙ্ক স্মাইদিও একসময় এসেছিলেন। ব্রিটেনের মানুষ। জানা নেই তাঁর আর-কোনও পরিচয় আছে কিনা! কিন্তু হিমালয়ের ওই রঙিন বনই তাঁকে পরিচিত করেছে পৃথিবীর মানুষের কাছে। 'দ্য ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স'—বিখ্যাত বই। ফ্রাঙ্ক স্মাইদিরই লেখা। পড়লে বোঝা যায় পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে-থাকা উপত্যকাটির কী অপরূপ বর্ণময়তা! এত রঙ কোথায় পেল!

আবার সেলিম আলির পাখির বর্ণনা যেন একইভাবে অভিভূত করে! অমন বিচিত্র রঙ, আচার-আচরণ, শরীরের গড়ন! বৈচিত্রের মাপকাঠিতে গাছপালা বা পশুপাখি কেউই যেন কম নয়! একটু ভাবলেই হাজারো প্রশ্ন উঁকি দেয়। আর সেগুলোর উত্তর পেতে ভরসা করতে হবে বিজ্ঞানীদের ওপর। উপায় নেই, কারণ তাঁরাই জানেন—প্রকৃতি কীভাবে এদের সাজিয়েছে। জিজ্ঞেস করলে উত্তর মেলে ঠিকই, কতকগুলো খটোমটো শব্দও হজম করতে হয়। তবু কৌতূহল তো থাকেই। পৃথিবীতে এত রকমের জীব কীভাবে জন্মাল, পৃথিবীর জন্মের সময় থেকেই কি ওরা রয়েছে? মানুষের মতো প্রত্যেক জীবেরও হয়তো একটা ধারা আছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেহারার আদল পালটেছে। তারই কোনও ধাপে পৌঁছে এখনকার রূপ পেয়েছে। এরকম নানান সম্ভব-অসম্ভব টানাপোড়েনে যেন দিশেহারা হতে হয়!

কিন্তু উত্তর যে পাওয়া যায়নি, তা নয়। দেড়শো বছরের একটু কম সময়ের আগে বিজ্ঞানী ডারউইনের এক ধারণার কথা জানা গিয়েছিল। সেই ভাবনা জীবকুলের বৈচিত্রের কারণ বুঝতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন জীব পৃথিবীর নানান জায়গার জল মাটি বাতাস, এমনকী চারপাশের অন্যান্য জীবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেদের পালটেছে। আর যারা এটা পারেনি, তাদের বেশিদিন সুযোগ হয়নি টিকে থাকার। এভাবেই ধরন-ধারণ পালটে একটা জীব থেকে অন্য জীব

পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি পিছনে ফিরে যাওয়া যায়, অতি সরল, সাদামাটা কোনও-না-কোনও জীব পাওয়া যাবে। সেখান থেকেই শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে এখনকার জীবকুলের মহীরূহটার জন্ম। এ-নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে মতের বিশেষ কোনও ফারাক নেই। এখনকার ছোটরাও এই ভাবনার সঙ্গে পরিচিত।

ওই আদিমতম জীবটার জন্মবৃত্তান্ত কী? এ-প্রশ্ন করলেই বিজ্ঞানীরা একটু অস্বস্তিতে পড়েন। কীরকম জড়সড় হয়ে বোঝানোর চেষ্টাও করেন। শেষপর্যন্ত যেন নিশ্চিত করতে পারেন না। তাঁরা এখনও 'হয়তো কিম্বা নয়তো'-জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেই জাল কেটে বেরোবার মতো ধারালো অস্ত্র খুঁজে পাননি। থেমেও নেই, পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের অনেকেই প্রতিনিয়ত এই বিষয়ে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন। তার কিছু কথা জানা যায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রায়ই সে-সব চোখে পড়ে। কখনও ভাবনার বিষয়গুলো বেশ রোমাঞ্চকরও মনে হয়। অবশ্যই যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাছে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার খুঁটিনাটি দিকগুলো বড় জটিল বা দুর্বোধ্য লাগতেই পারে। অনেকটা অতল সাগরের তল খোঁজার মতো। এ তো সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কাজ। তলের ছোঁয়া নাই-বা পেলাম, হাঁটুজলে ডুব দিতে অসুবিধে নেই। সেভাবেই গবেষণার আবর্তে ঘুরপাক না-খেয়ে, সাদামাটাভাবে নির্যাসটুকু বোঝার চেষ্টা করলে অন্তত জানা যায় কত দূর এগিয়েছে।

মানুষ যখন এত সভ্য ছিল না, তখনও বিস্ময়ের একটা বড়সড় ঝুলি তাদের সঙ্গী ছিল। সেই ঝুলিতেও এই জিজ্ঞাসা অনেকটা জায়গা জুড়েই থাকত। এখন বিজ্ঞানচর্চার বাড়বাড়ন্তে খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেলেও, সে-সময় এই সুযোগটুকুও ছিল না। অতটা পিছনে না-হেঁটে, আড়াই হাজার বছর আগে মানুষ কী ভাবত—তা জানা অনেকটাই সহজ হয়। এর প্রমাণ পাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। সেখান থেকেই শুরু করা যাক।

বিজ্ঞানচর্চায় গ্রিসদেশের বেশ নামডাক ছিল। ইতিহাসকারদের বা বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদদের আলোচনায় ডেমোক্রিটাস, হিপোক্রেটিস, অ্যানাক্সাগোরাস, পিথাগোরাসের মতো নাম শোনা যায়। এঁরা সকলেই আড়াই হাজার, দু'-হাজার বছর আগে গ্রিসে বিজ্ঞানচর্চায় মেতে থাকতেন, নানান বিষয়ে। অ্যানাক্সাগোরাস চাঁদ, তারা, সূর্যের রহস্যের বেড়াজাল ছিঁড়তে পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। মহাবিশ্ব, মহাকাশের ভাবনার মধ্যে তিনি প্রাণের সৃষ্টি নিয়ে একটা ধারণা দিয়েছিলেন। 'প্যানসপেরমিয়া' অনুমিতি। 'প্যানসপেরমিয়া' হল গ্রিক শব্দ। বাংলায় এর অর্থ 'বীজসমূহ'। অ্যানাক্সাগোরাস বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সব কিছুই, প্রাণ সৃষ্টির মূলেও ওই বীজ। মহাজগতের কোথাও থেকে পৌঁছেছিল

মঙ্গলের প্রাণ নিয়ে গবেষণা চলছে

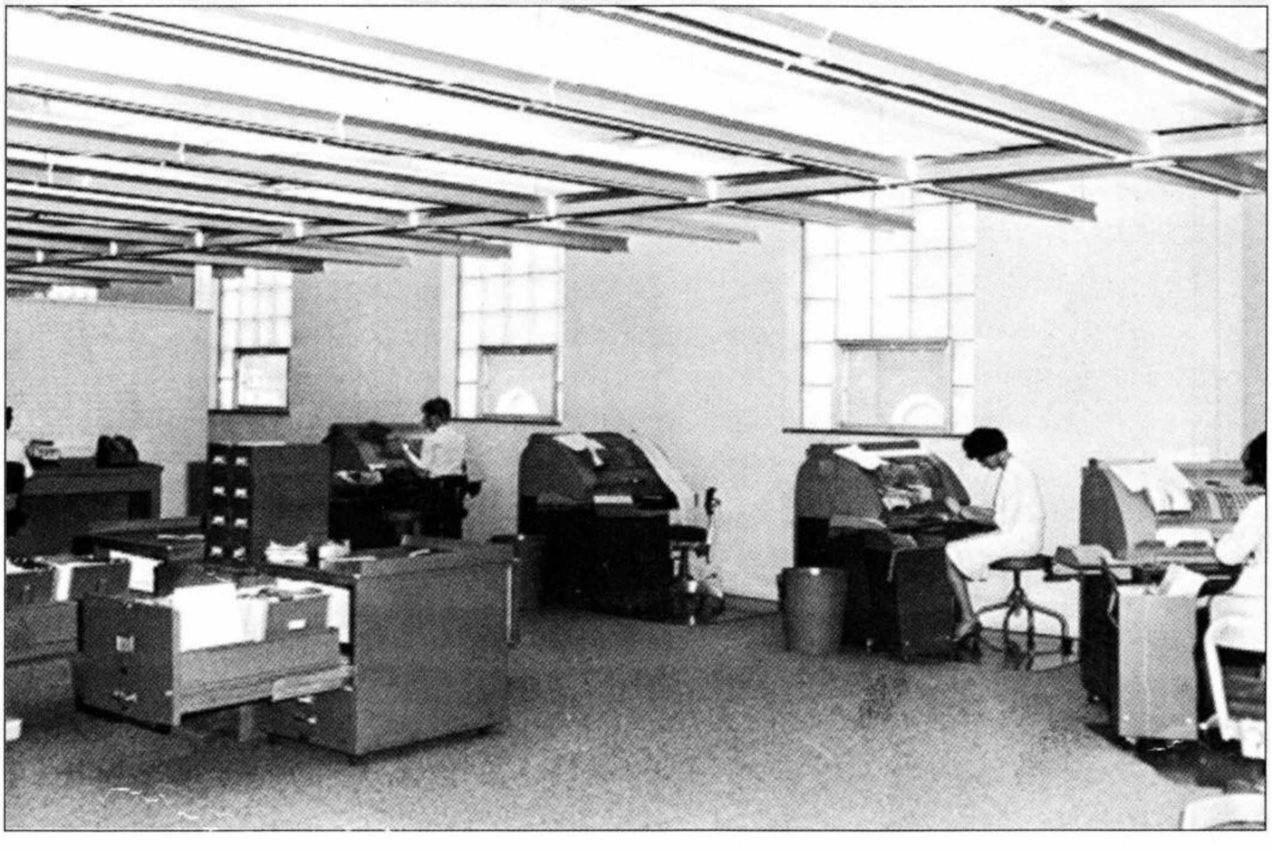

এই গ্রহে। পরে নানাভাবে মিলেমিশে প্রথম প্রাণের জন্ম দেয়। শুনলে অদ্ভুত মনে হয়, এখনকার বিজ্ঞানীরা অ্যানাক্সাগোরাসের ভাবনাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারছেন না।

এখন তো বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে। ২০ শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উত্তরণ ঘটেছে লাগামছাড়া। বিশেষ করে মহাকাশবিজ্ঞান। ওই শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু হয়েছে মহাকাশ অভিযান। কখনও মানুষ, কখনও-বা যন্ত্রমানব কিম্বা মহাকাশযান ছুটেছে গ্রহান্তরের খবরাখবর জানতে। শুরুটা ছিল নিজের সংসারের মধ্যেই। পৃথিবীর সংসার তো খুব বড় নয়। উপগ্রহ চাঁদ তারই এক সদস্য। কিন্তু শুধু নিজেদের নিয়ে আটকে থাকলেই হয় না। আত্মীয়-অনাত্মীয়দের খোঁজও রাখতে হয়। সেই চিন্তা নিয়েই সৌরপরিবারের নানা প্রান্তে যাতায়াতের শুরু। পৃথিবী থেকে বহু, বহু দূরে সৌরজগতের এক প্রান্তে পড়ে-থাকা প্লুটোয় এখন চোখ পড়েছে। হয়তো পৌঁছেও যাবে। এভাবেই জানা গেছে 'ইউরোপা', 'টাইটান'-এর কথাও।

নতুন নতুন তথ্যের ভিড়ে বিজ্ঞানীরা যেন মাতোয়ারা! কারও শরীরে জল, বরফ কিম্বা জৈব বস্তু। এই তথ্যগুলো আরও বেশি করে বিজ্ঞানীদের মাতিয়ে তোলে। অনন্ত, অসীম নিখিলে কেউ কোথাও নেই, শুধু পৃথিবীর বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নানারকম জীব। ভয়ানক একাকিত্ব যেন সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। এই পরিবারেরই যদি কোথাও কোনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়! জল, বরফ বা জৈব বস্তু কি তারই কোনও ইঙ্গিত? এ-সব যখন তোলপাড় করে তোলে, সেইসময় আরও নতুন কিছু পেলে তো কথাই নেই। উল্কা, গ্রহাণুরা সেই কাজই করেছে। পৃথিবীর টানে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে ভয়ংকর বেগে এসে আছড়ে পড়ে। সেগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাটাছেঁড়া করে দেখতে চান, কোনও বাড়তি রসদ যদি মেলে। অনেক সময় পেয়েছেনও।

অনেকেই ওদের কথা শুনলে আঁতকে ওঠে। এ-নিয়ে কোনও রসিকতারও সুযোগ নেই। দৈত্যাকার ডাইনোসরদের নাকি গ্রহাণু বা উল্কার দৌরাত্ম্যে পৃথিবী ছাড়া হতে হয়েছিল! পৃথিবীর জন্মের পর থেকে দু'-একবার এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখিও হয়েছে। তবে সব গ্রহাণু বা উল্কার এত ক্ষমতা থাকে না। সেগুলো বরং কাজেই লাগে। মহাবিশ্বের যেখান থেকে আসে, সেখানকার কিছু ছাপ তো থেকেই যায়। কাজে লাগে মহাকাশ গবেষণায়। তখন ওরা মারণাস্ত্র নয়, যেন মহাবিশ্বের দূত। এরকম কিছু উল্কার কথা জানা যায়। দু'-দশক ধরে গোটা তিরিশেক নমুনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানীরা ওগুলোর খুঁটিনাটি দিকগুলোও দেখেছেন। চাঞ্চল্যকর তথ্যও পেয়েছেন। নমুনাগুলোর বেশ-কিছুর শরীরে লুকনো ছিল অণুজীবদের

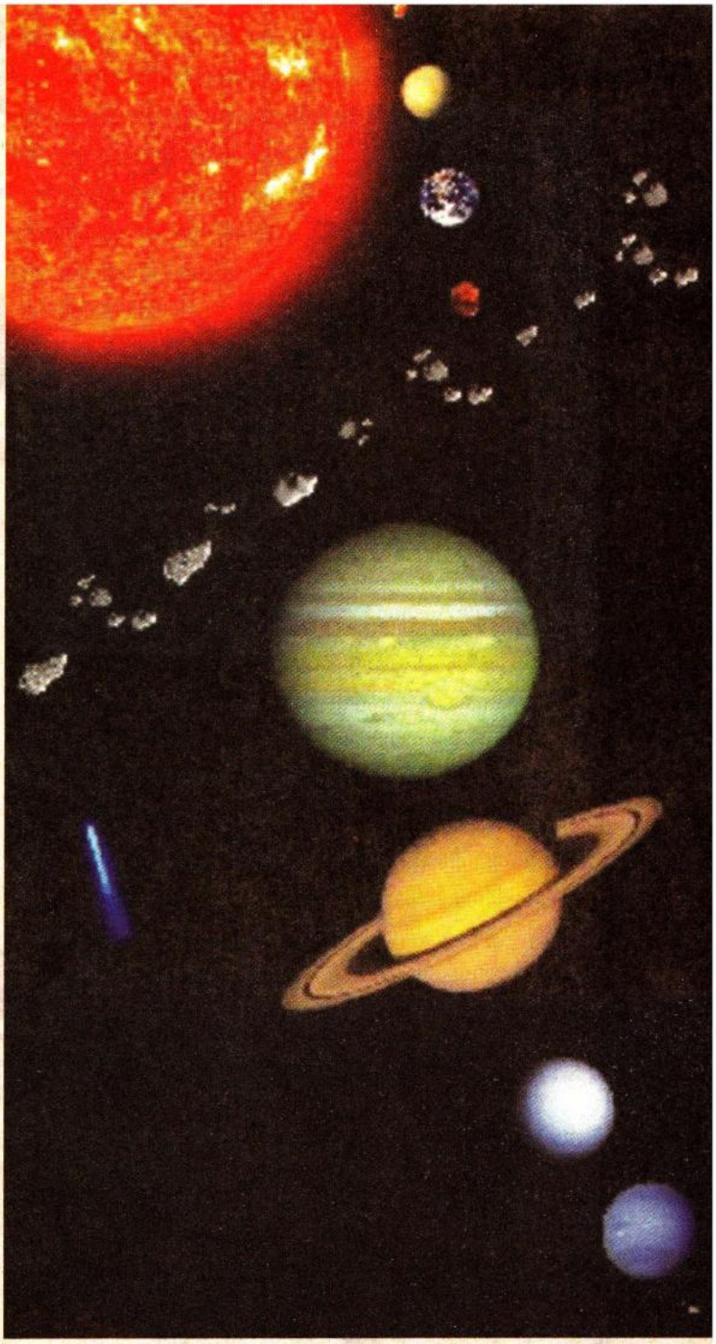

সৌরজগৎ

চিহ্ন। আর ওরা এসেছিল মঙ্গল থেকে। এই সম্পর্কেও গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন।

তাহলে আড়াই হাজার বছর আগের অ্যানাক্সাগোরাসের ভাবনাই কি ঠিক? সবটা না-হলেও, বেশ-কিছু তো ঠিক— অনেক বিজ্ঞানী এভাবেই বলেছেন। বিজ্ঞানীমহলের একটা অংশ কিন্তু এই মতকে মেনে নিতে চাইছেন না। তাঁদের মতে, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল নানান রাসায়নিক উপায়ে, পৃথিবীর মাটিতেই। এর পক্ষেও অনেক যুক্তি আছে। মতবিরোধের

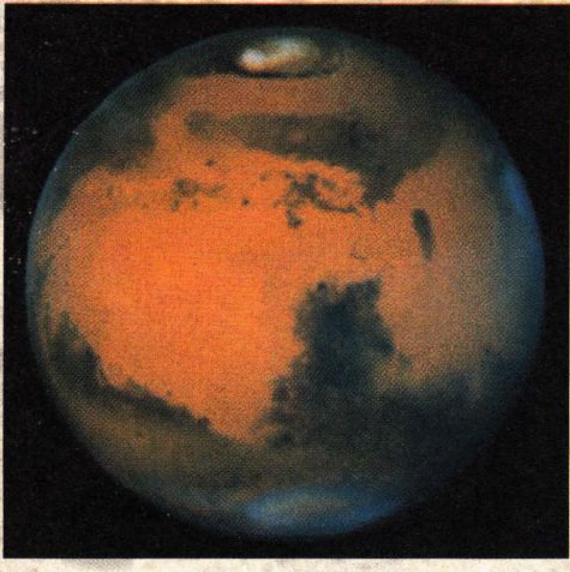

মঙ্গল

মধ্যে না-গিয়ে, আলাদাভাবে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবলেই হয়। কারণ, গবেষণা তো বিজ্ঞানীদের বা গবেষকদের কাজ, তার নির্যাসটুকু চর্বিতচর্বণ না-করে আমাদের উপায়ও নেই।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হয়নি, পৃথিবীর বাইরের অন্য কোনও গ্রহ থেকে পৃথিবী আমদানি করেছে প্রাণের বীজটুকু—পরে অবশ্য তা সযত্নে লালিত হয়েছে। বাইরের গ্রহ বলতে আপাতভাবে মঙ্গলকে সেই উৎস ভাবা যেতে পারে। পৃথিবীর মানুষ এই গ্রহ থেকে মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠায় বা নিজেরা যাওয়ার কথা ভাবে। যদি ঠিক উলটোটা হয়? অর্থাৎ, মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে আসতে হবে। সে-ও তো অন্য-এক অভিযান, যা করে মঙ্গলের উল্কাগুলো। এই অভিযানও দুর্গম, কিন্তু কতটা রোমাঞ্চকর—তা বলতে পারে উল্কার শরীরে-থাকা অণুজীবদের দল।

মঙ্গল যদিও পৃথিবীর সবথেকে কাছের প্রতিবেশী, কিন্তু দূরত্বটা নেহাত কম নয়। প্রায় ৯৭০ লক্ষ কিলোমিটার। মহাবিশ্বের মহাশূন্যে অবিরাম ঘটে চলেছে ঘাত-প্রতিঘাত, মহাজাগতিক বস্তুদের ছুটে বেড়ানো, একে অপরের ঘাড়ে আছড়ে পড়া। তাতেই অন্য গ্রহদের মতো মঙ্গলের শরীরেও ছোট-বড় নানান মাপের টুকরো খসে পড়ে।

ছোট-বড় যা-ই হোক-না-কেন, মঙ্গল সহজে সেগুলোকে রাজত্ব থেকে বেরোতে দেয় না। শুধু মঙ্গল কেন, পৃথিবীর স্বভাবও তাই। সে-কারণে মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাড়ি

মঙ্গলের দিকে মহাকাশযান

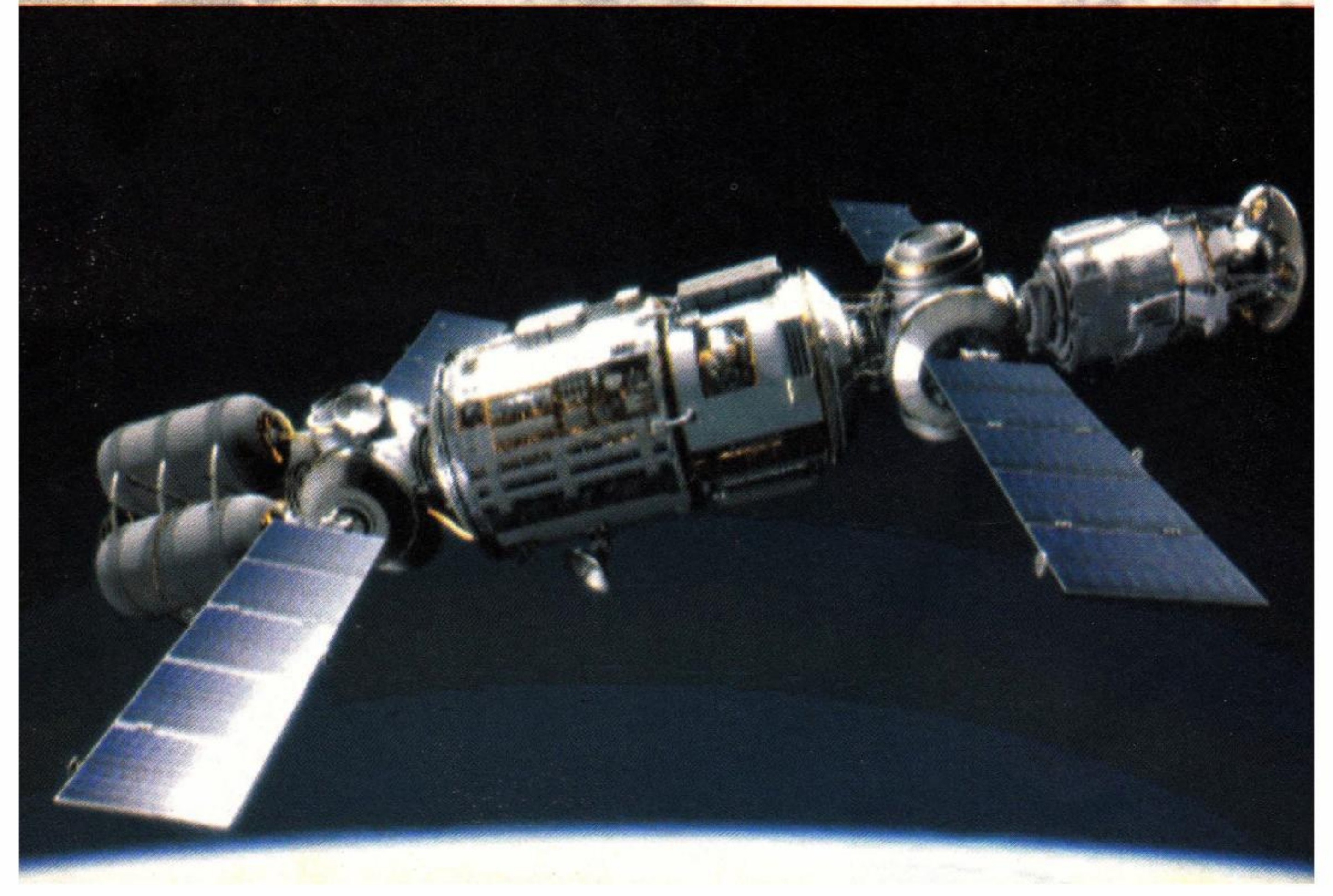

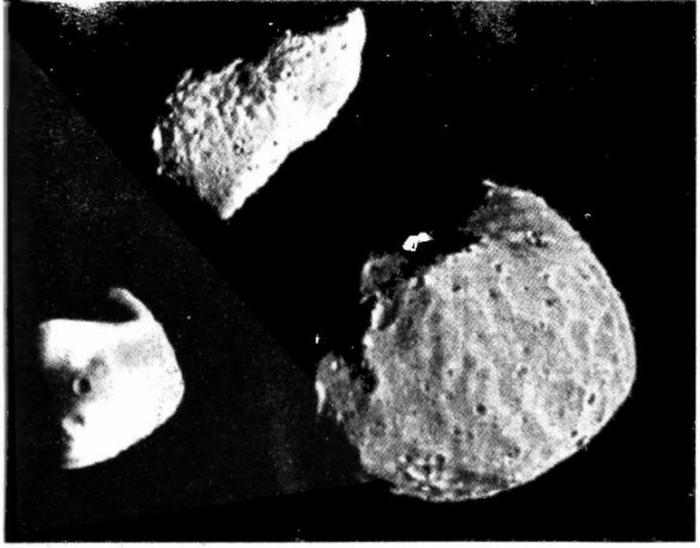

গ্রহাণু

দেওয়ার সময়ে সাহায্য নিতে হয় বেশ ক্ষমতাঅলা উৎক্ষেপক বা রকেটের। উৎক্ষেপকের কাজ হল পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বের করে দেওয়া। কিন্তু মঙ্গলের টান ছেঁড়ার জন্য ওই শিলার টুকরোগুলোকে উৎক্ষেপক বানিয়ে দেবে কে? বিজ্ঞানীরা এদিকটা ভেবেছেন। তাঁদের মতে, যে সংঘাতে টুকরোগুলোর জন্ম, তাতেই ওরা ভয়ানক গতি পায়। মঙ্গল পারে না ওই গতির শিলাখণ্ডগুলোকে আটকে রাখতে। ফলে ওরাও বেরিয়ে পড়ে মহাশূন্যে।

সবসময় যে পৃথিবীর দিকে ওরা এগিয়ে আসে, তা-ও নয়। যদি পৃথিবীর দিকে আসে, তাতেও অভিযান শেষ করতে কয়েক লক্ষ বছর সময় লাগার কথা। এমন কোনও রাস্তা নেই যেখান দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারে! অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এর থেকে কম দূরত্বে আসা সম্ভব। তাঁরা দেখেছেন উল্কার ওজন ও আকার এজন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো, কম ওজনের উল্কারা সোজাসুজি, অনেকটা দূরত্ব এড়িয়ে পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। ফলে সময়ও কম লাগে।

যত কম দূরত্বই হোক, পৃথিবী আর মঙ্গলের মধ্যেকার দুর্গমতাকে উপেক্ষা করবে কীভাবে! প্রথমেই ভয়ানক উত্তাপের মধ্যে পড়তে হয়। এটা সাধারণভাবেই বোঝা যেতে পারে। যখন মঙ্গলের গায়ে আঘাত লাগে, ভীষণ ঘর্ষণ তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। যদিও উল্কার অভিযানের আলোচনা হচ্ছে, লক্ষ্যটা হল অণুজীবদের এই অভিযানের সঙ্গী হওয়া কতটা সম্ভব, তা খতিয়ে দেখা। সত্যিই যদি অত তাপ সইতে হয় মঙ্গলের টুকরোগুলোকে, অণুজীবদের পক্ষে সম্ভব নয় সেই অবস্থায় টিকে থাকা। কিন্তু ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার এক গবেষক পরীক্ষানিরীক্ষায় জেনেছেন, এটাও সম্ভব। ওই বিজ্ঞানী হলেন এইচ জে মেলোশ। তাঁর মতে, পদার্থবিজ্ঞানের জটিল ব্যাখ্যায় বোঝানো যায় যে, অনেক টুকরো ওই অসহ্য তাপ না-সইলেও অণুজীবদের অসুবিধে হয় না। ওরা মঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

এবার মঙ্গল ছেড়ে উল্কা ছুটছে পৃথিবীর দিকে। ধরা গেল, আসল পথটা এড়িয়ে সরাসরি, কম দূরত্ব পেরিয়ে আসছে। কিন্তু সূর্যর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রেহাই দেবে কে? পৃথিবী থেকে যে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় মহাকাশে, তাতে যদি অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতি করার মতো কিছু থাকে, নানা উপায়ে আড়াল করার চেষ্টা হয়। অণুজীব হলে তো আর কথাই নেই। একবার পরীক্ষার জন্য অণুজীবদের কৃত্রিম উপগ্রহে পাঠিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিছু কিছু অণুজীবকে অ্যালুমিনিয়াম চাদরে মুড়ে উপগ্রহে পাঠানো হয়েছিল। ছ'-মাস পরে যখন উপগ্রহ ফিরে এসেছিল, চাদরমোড়া অণুজীবগুলো ঠিকঠাক ছিল। আর যেগুলোকে কোনওরকম না-ঢেকে পাঠানো হয়েছিল, একটাও বেঁচে ফেরেনি। ফলে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে আসার সময় উল্কার শরীরে থাকা অণুজীবগুলো সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির খপ্পরে পড়ে কী করবে? ওদের তো ঢাকার জন্য কোনও অ্যালুমিনিয়াম চাদরের ব্যবস্থা ছিল না, কেই-বা করবে!

এ-প্রশ্ন যে বিজ্ঞানীদের ভাবায়নি, তা বলার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তাতেও অণুজীবরা ওই উল্কায় টিকে থাকতে পারে। দুটো কারণে। (১) অণুজীবরা উল্কার শরীরের অনেকটাই ভেতরে থাকে, ফলে বাইরের অংশটুকু আবরণ হিসেবে কাজ করে। আর (২) অণুজীবদের শরীরের লবণ ও গ্লুকোজ অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে লড়াই করার মতো ক্ষমতা জোগায়। এ-সব মিলিয়ে কোনওভাবে অতিবেগুনি রশ্মির চোখে ধুলো দিয়ে অভিযান চালিয়ে যেতে পারে। আর-একটা বিষয় নিয়েও কিন্তু জিজ্ঞাসা থেকে যায়। সেই দিকটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীদের গবেষণার অনেককিছুর মধ্যে এটাও অত্যন্ত মনের মতো বিষয়।

পৃথিবীতে পাওয়া মঙ্গলের উল্কা

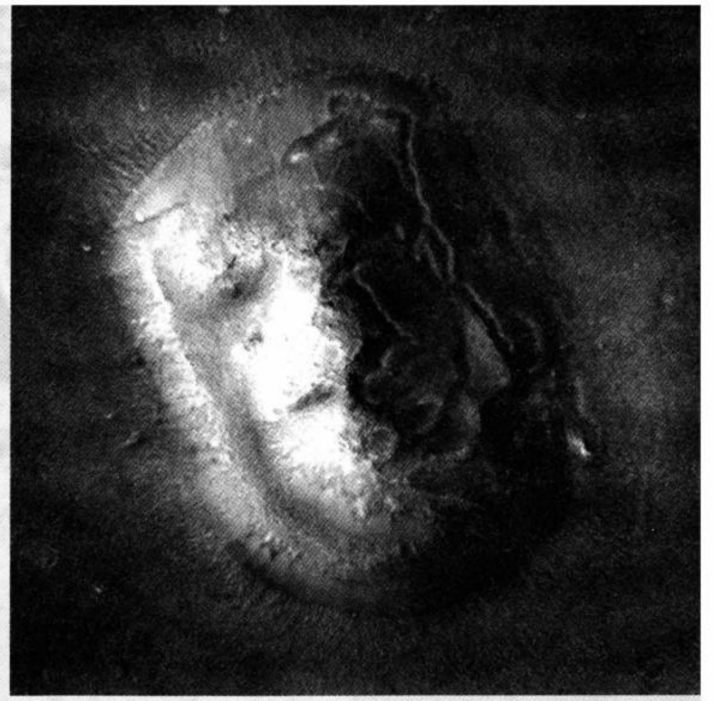

পৃথিবীতে পাওয়া মঙ্গলের রহস্যবস্তু

প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব একটা চৌম্বক বলয় থাকে। নানান ধর্মের আয়নিত কণা ছুটে বেড়ায় গ্রহদের মধ্যেকার জায়গাগুলোতে। কোথাও কোথাও রীতিমতো ঝড়ও বয়। কিন্তু যে-কোনও গ্রহের চৌম্বক বলয়ে অন্য গ্রহের ওই বলয়ের কোনও উপাদান সহজে ঢোকার সুযোগ পায় না। তাতে কী আছে! মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে আসার সময় উল্কাগুলোর ওপর আয়নিত কণাগুলো যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন ভয়ানক বিকিরণ হতে থাকে। ওই অবস্থায় উল্কার শরীরে লুকিয়ে-রাখা অণুজীবরা কি নিরাপদে থাকে? এ-প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। ঠিক এ-নিয়ে বিশেষভাবে কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা বিজ্ঞানীরা করেননি। তাই পৃথিবী অভিযানে আয়নিত কণার উপদ্রবকে না-মেনে নেওয়ার কোনও উপায় নেই। অন্য গ্রহ থেকে অণুজীবদের আসার ক্ষেত্রে এ-দিকটা অবশ্যই বড় বাধা। এমনকী টিকে থাকার ক্ষেত্রেও।

যদি কোনওরকমে আয়নিত কণাগুলোর হাত থেকে রেহাই পায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার মুখে আরও-একবার যুদ্ধ করতে হয়। পৃথিবীকে অন্য গ্রহদের থেকে আড়াল করে রাখে বায়ুমণ্ডল। তা-যেন একনিষ্ঠ প্রহরী। বাইরে থেকে যে-কেউ ঢুকতে গেলেই ভয়ানক বাধা পেতে হয়। ওই প্রহরীদের কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। প্রহরার কাজটা করে পরোক্ষভাবে। বায়ুমণ্ডলের ওপরের জায়গায় ঘর্ষণ হয়। তাতে আগুন জ্বলে যেতে পারে। জ্বলে-পুড়ে উল্কাই হোক বা অণুজীবই হোক, পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। পৃথিবীর মহাকাশযান পৃথিবীতে ফিরতে গিয়ে এর মুখোমুখি হয়েছে। আর পৌঁছতে পারেনি। এরকম অনেক ঘটনার কথাই বলা যায়।

অবশ্য এ-নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবনার কথা জানা গেছে এডওয়ার্ড অ্যানডারস-এর গবেষণায়। তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনরিকো ফার্মি ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর মতে, ছোট চেহারার উল্কা বা অন্য গ্রহ থেকে আসা ধূলিকণাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের ভাগে সাধারণভাবে বিপদ ঘটে না। ছোট চেহারার ঘর্ষণ কম হয়, তাপমাত্রা বাড়ে না। ফলে ছোটখাটো মাপের উল্কার শরীরে অণুজীব থাকলেও অসুবিধে হয় না। নিরাপদে পৌঁছে যায় পৃথিবীতে।

তবে এই প্রসঙ্গে আরও-এক গবেষণার কথা বলে রাখা দরকার। তা হল এক কৃষিবিজ্ঞানীর ভাবনা। আর্থার ডাবলিউ অ্যান্ডারসন। তিনি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন যে, জীবাণু বা অণুজীবদের প্রাণ হল 'কই মাছের প্রাণ'। সহজে হার মানে না। মহাকাশের বা মহাজাগতিক বিকিরণকে পাত্তা না-দিয়েও টিকে থাকতে পারে। যদিও তিনি খুব নিশ্চিত নন। এই কথা বলার অন্য কারণ আছে, তিনি মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণে অণুজীবদের হাল-হকিকত নিয়ে গবেষণা করেননি। কিন্তু পারমানবিক চুল্লির মতো ভয়ানক পরিবেশে জীবাণুদের টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। এটা থেকে অনেকে মনে করছেন যে, মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ অণুজীবদের বিশেষ কাবু করতে পারবে না। যদিও এতে অনুমান রয়েছে অনেকটাই।

এত কিছুর মধ্যে দিয়ে অন্য গ্রহ থেকে কোনও বীজাণু পৃথিবীতে পৌঁছে যেতেই পারে। আদিম পৃথিবীতে কি এভাবেই প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল? এতটা ভাবার সময় নিশ্চয়ই এখনও হয়নি। গ্রহান্তরের বীজাণু, না পৃথিবীর উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ওই আদিমতম জীবসৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল— এ-উত্তরের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। দু'-দিকেই যুক্তির বোঝা অনেক। আর সেগুলোকে মানা বা না-মানার মতো জ্ঞানগম্যি এখনও আমাদের নেই। আরও পরে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী যা বলবেন, তাই মেনে নিতে হবে। এছাড়া উপায়ই বা কী?

মঙ্গলের জমি

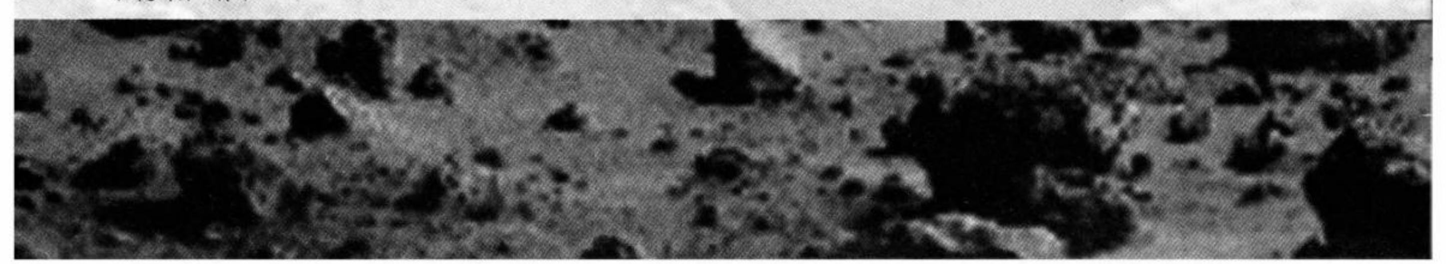

হাতি ও আমি

সব্যসাচী চক্রবর্তী

আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রাণী হাতি। বাঘ, গণ্ডার, হরিণ, কুমির, সিংহ, সাপ, ভালুক—সবাই ভালো। কিন্তু এদের চাইতে হাতি একেবারে আলাদা। বিশাল চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি, ভীষণভাবে পারিবারিক, প্রবল শক্তি এবং মমত্ববোধ। স্মৃতিশক্তি বা মনে রাখার ক্ষমতা অসীম। হাতি কখনও উপকার ভোলে না। ক্ষতি যে করেছে, তাকেও ভোলে না। অনেক সময় হাতিদের গল্প শুনলে মনে হয় যেন বানানো, মনগড়া। একটা হাতির কথা শুনেছিলাম—১৫ বছর পর একটা গাড়ি চিনতে পেরেছিল, যে-গাড়িটায় চেপে একজন লোক এসে তার বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেই লোকটাকে পায়নি, কিন্তু গাড়িটাকে কাগজের ঠোঙার মতো দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়েছিল!

হাতি এমন এক প্রাণী, যিনি অপমান সইতে পারেন না। জঙ্গলের মানুষেরা অনেকেই এর প্রমাণ দেবেন। আবার হাতির সামনে কান ধরে ক্ষমা চাইলে, অনেক সময় তাঁরা মাপ করে দেন। একটা হাতিকে বিরক্ত করার ফলে, সে গাড়ির রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল। কান ধরে ওঠ-বোস করলে এবং নাকে খত দিলে, তবে সে রাস্তা ছেড়ে চলে যায়! এটা ঘটেছিল ওড়িশার সিমলিপাল টাইগার রিসার্ভে, ১০ বছর আগে।

হাতিদের ব্যবহার নিয়ে অনেক কিছুই বলা যায়। যেমন, হাতিরা বেশিরভাগ সময় দল পাকিয়ে থাকে। ওদের হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। সেই মহিলাই সেই দলের নেত্রী, যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। সে বলে দেয় দলের বাকিদের—কোন জঙ্গলে যাওয়া হবে, কোনদিক দিয়ে যাওয়া হবে, কতদিন সেখানে থাকা হবে, তারপর কোথায় যাওয়া হবে, কোন জলাশয়ে জল-খাওয়া এবং চান করা হবে, ইত্যাদি।

আফ্রিকার হোক বা এশিয়ার— হাতিদের ব্যবহার সর্বত্রই এক। হাতিদের সঙ্গে বাইসনদের ব্যবহারের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। তবে হাতিরা বাইসন বা বুনো মোষদের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। হাতিরা নিজেদের মধ্যে কথাও বলে, খুবই লো-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ দিয়ে সংকেত পাঠায়। একদল হাতি আর-এক দলের সঙ্গে বহু মাইল দূর থেকে যোগাযোগ করতে পারে।

হাতিদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ নয়। তবে বহুদূর থেকে গন্ধ শুঁকে বুঝে নেয় কে আসছে—শত্রু না মিত্র। আফ্রিকার হাতিরা—মহিলা হোক বা পুরুষ—সকলেরই গজদন্ত থাকে। কিন্তু এশিয়ার হাতিদের মধ্যে শুধু ছেলেদের গজদন্ত হয়, মেয়েদের হয় না। বহু শতাব্দী ধরে হাতিদের পোষ মানানো হয়েছে। রাজা-মহারাজারা হাতিতে যাতায়াত করতেন, হাতিদের যুদ্ধে

ব্যবহার করা হত, উৎসবে সাজানো হত, ভারী মাল সরানোর কাজে লাগানো হত, এমনকী চাষের জমিতে লাঙল টানার কাজও করানো হত। হাতির পিঠে চড়ে সাহেবরা হরিণ ও বাঘ শিকার করতেন। আজও হাতির পিঠে চেপে আমরা অরণ্যভ্রমণে যাই। পোষা হাতি দিয়ে বুনো হাতি ধরা হয়, পোষ মানানো হয়। কেরালা এবং কর্নাটকে হাতিদের সাজিয়ে মন্দিরের পুজোয় উপস্থিত করানো হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং নেপালে আজও হাতিদের দিয়ে লগিং-এর কাজ করানো হয়। অরণ্য বিভাগের প্রতিটা জঙ্গলে হাতি আছে। সেই কুনকি হাতিরা বনকর্মীদের কাজের জন্যে একান্ত জরুরি।

আমাদের উত্তরবঙ্গের গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে একটা পোষা হাতি ছিল, যার কথা বনকর্মীদের মুখে খুব শুনেছি। তার নাম 'যাত্রাপ্রসাদ'। এই যাত্রাপ্রসাদকে ঘিরে অনেক ঘটনা আছে। একটা ঘটনা বলি। গরুমারার জঙ্গলে তখন যাত্রাপ্রসাদের পিঠে চড়ে বনভ্রমণ করানো হত টুরিস্টদের। একবার টুরিস্টরা একটা গণ্ডার দেখছিল হাতির পিঠ থেকে। হঠাৎ গণ্ডারটা আক্রমণ করে। যাত্রাপ্রসাদকে সচরাচর কিছু করতে সাহস পেত না কোনও জন্তু। কারণ, যাত্রাপ্রসাদের একটা বিশালাকার দাঁত ছিল। কিন্তু পিঠে মানুষ থাকলে যাত্রাপ্রসাদ যেন পোষা গরু! গণ্ডারটা বোধহয় সেই সুযোগটাই নিয়েছিল। সে তেড়ে এসে তার খড়গ দিয়ে যাত্রাপ্রসাদের পেট ফুঁড়ে দেয়, এবং পালিয়ে যায়। যাত্রাপ্রসাদ কিন্তু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। করলে হয়তো পিঠে-বসা টুরিস্টরা পড়ে যেত। তাই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাহুত তার ওয়াকি-টকিতে খবর দেওয়ায় অন্য হাতি নিয়ে বনকর্মীরা এলো। টুরিস্টদের সেই হাতির পিঠে তুলে দেওয়া হল। যাত্রাপ্রসাদের পিঠ থেকে 'হাওদা' নামানো হল। তারপর যাত্রাপ্রসাদ শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে যাত্রাপ্রসাদের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে। নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে এসেছে। তক্ষুনি ভেটেনারি ডাক্তার তাকে অপারেট করে, ক্ষত সেলাই করে, মলম লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। যাত্রাপ্রসাদ আবার সেখান থেকে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে এলো। তার সেই ক্ষত সারতে অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু তার কাজ থেমে থাকেনি। দু'-এক সপ্তাহের ভেতরেই সে কাজে নেমে পড়েছিল। ক্ষত সারার পরই কিন্তু সে গণ্ডারটাকে খুঁজে বার করে তাকে দু'-ঘা দিয়েছিল।

এই যাত্রাপ্রসাদের নামে গরুমারার জঙ্গলের ভেতর একটা ওয়াচটাওয়ার তৈরি হয়েছে। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। অবশ্য আরও অনেক ভালো হাতি আছে বা ছিল সেখানে। যেমন 'চন্দ্রচূড়'। তার নামেও একটা ওয়াচটাওয়ার করা হয়েছে। চন্দ্রচূড় বা যাত্রাপ্রসাদ—কেউই আজ বেঁচে নেই।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের হাতিদের নিয়ে অনেক গল্প আছে। 'সন্দেশী' প্রকৃতি-পড়ুয়ারা ওখানে গিয়ে, ওখানকার লোকজনের কাছে শুনবে, আরও ভালো লাগবে। এখনও ওখানে বহু হাতি আছে, যারা কাজ করছে। পুরুষ হাতিদের মধ্যে আছে 'জনার্দন', 'মেঘলাল', 'সূর্য' এবং 'কিরণরাজ'। মহিলা হাতিদের সংখ্যা ছয়। 'শিলাবতী', 'কাবেরী', 'অমন', 'ফুলমতি', 'হিলারী' এবং 'তিস্তা'। এদের মধ্যে শেষের তিনজন এখনও ছোট, তাই ওরা কোনও কাজ করে না। ওদের প্রশিক্ষণ চলছে। প্রত্যেকটা হাতির আলাদা আলাদা গল্প আছে। প্রত্যেকটা হাতি আর-একজনের থেকে আলাদা স্বভাবের। প্রত্যেকেই বনকর্মীদের অত্যন্ত প্রিয়জন। এই হাতিরা (যারা কাজ করে) মাইনে পায়। অবসর নেবার পর পেনশন পায়!

গরুমারা ছাড়াও আরও অনেক জঙ্গলে হাতিদের পিঠে চড়েছি। যেমন জলদাপাড়ায়। মধ্যপ্রদেশের কান্‌হায় ও বান্ধবগড়ে। উত্তরাঞ্চলের করবেট-এ। ঝাড়খন্ডের বেতলায়। সর্বত্রই এদের এক প্রশিক্ষণ। এক ধরনের কাজ।

হাতির পিঠে টুরিস্টরা। কান্‌হা

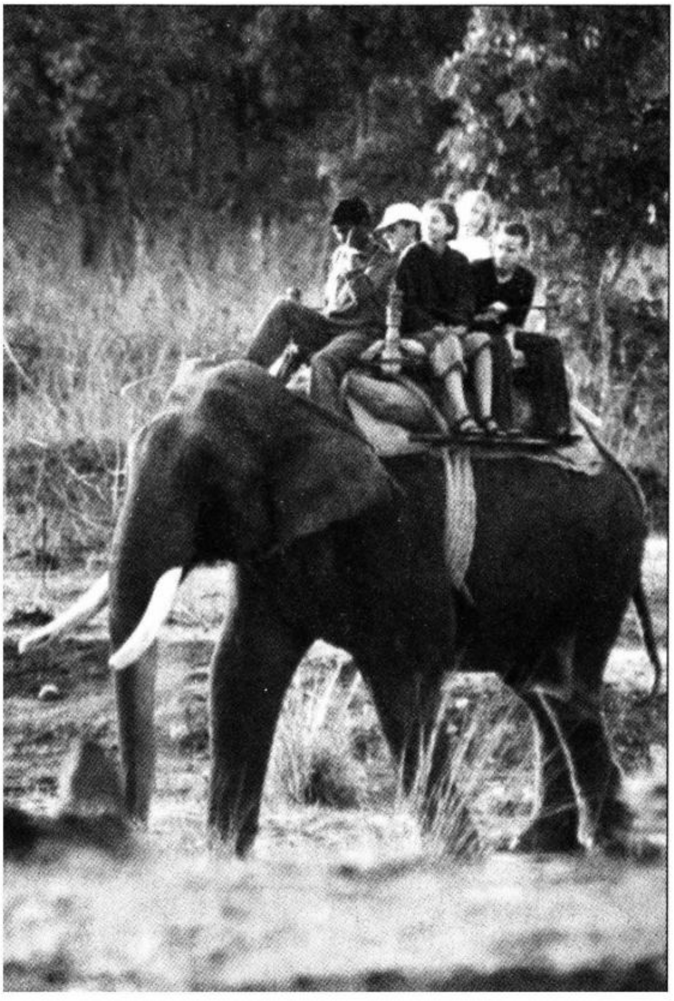

গরুমারায় জনার্দনের পিঠে

বেতলার জঙ্গলের এক মাহুতের কাছে গল্প শুনেছিলাম একদল টুরিস্টের। তারা সবাই হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে বেড়াতে গেছে। তাদের খুব ইচ্ছে বাঘ দেখার। মাহুত তো মোটামুটি জানে বাঘ কোন জায়গায় সাধারণত বসে থাকে। মাহুত তার হাতিটাকে সেখানে নিয়ে গেছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন—বাঘবাবাজি বসেছিলেন একটা বিশাল পাথরের ওপর, হাতির পিঠ থেকে দু'-ফুট ওপরে! বাঘ তো হাতি এবং টুরিস্টে অভ্যস্ত। কাজেই সে নড়ল না। টুরিস্ট তো আর বাঘে অভ্যস্ত নয়, তাই টুরিস্ট ভ্যাবাচ্যাকা! বাঘের চোখে চোখ রেখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে এক ভদ্রলোক জ্ঞান হারালেন, এবং হাতির পিঠ থেকে গড়িয়ে সোজা মাটিতে। সবাই হৈহৈ করে উঠল। মাহুত সবাইকে শান্ত করল। তারপর হাতিকে বসার নির্দেশ দিল। হাতি বসল। মাহুত হাতি থেকে নেমে ভদ্রলোকের মুখে-মাথায় জল ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফেরাল। তারপর আবার তাকে হাতিতে তুলে নিল। আর টুরিস্টরা সে-দিক মাড়ায়নি। হাতি ঘুরিয়ে ফিরে এলো। বাঘ কিন্তু শেষঅবধি এক জায়গায় বসে সব লক্ষ করছিল। বোধহয় মনে মনে বলেছিল, 'যাব্বাবা! আমার তো কোনও দোষ নেই। লোকটা হঠাৎ পড়ে গেল কেন?' হাতিটাও হয়তো বাঘকে বলেছিল, 'কিছু মনে করিস না। দুর্বল প্রকৃতির জন্তু তো, তাই ব্যাটা টাল সামলাতে পারেনি। তুই বসে থাক, আমি এদের ছেড়ে আসি।'

আমাদের সঙ্গেও একবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। আমরা তখন বান্ধবগড়ে। আমার বন্ধু জয়দীপ ছবি তুলবে বলে আমাদের আর-এক বন্ধু বিশ্বজিৎ করল কী—জয়দীপের ক্যামেরার সামনে ডালপালা হাত দিয়ে সরিয়ে ধরেছিল। হাতির পিঠে দু'জনেই, সামনে মাটিতে বসে বাঘ! বিশ্বজিৎ চশমা পরে। ওর হাত থেকে একটা কাঁটাভর্তি ডাল ছেড়ে যায়। ডালটা সোজা হওয়ার পথে বিশ্বজিতের চশমাটা খুলে নেয়। 'সপাং' করে আওয়াজ হতেই শুনলাম বিশ্বজিতের ভয়ার্ত চিৎকার: 'এই যাঃ! চশমাটা পড়ে গেল! চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাবো না! কিছু একটা কর!' ব্যাপারটা বুঝতে মাহুতের একটু সময় লাগল! আমরা দেখলাম বাঘ একবার চশমাটা দেখছে, একবার বিশ্বজিৎকে। মাহুতের নির্দেশে হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে নিপুণ দক্ষতায় চশমাটা আলতোভাবে তুলে

মাহুতকে দিয়ে দিল। সেই শুঁড় দিয়ে—যা দিয়ে বাঘকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে, গাছের ডাল ভেঙে ফেলতে পারে, যে শুঁড় ১৫০০ মাস্‌ল দিয়ে আর মোটা শিরিষ কাগজের মতো চামড়া দিয়ে তৈরি—সেই শুঁড় দিয়ে একটা ৫০ গ্রামের চশমা তুলে দিল, একটুও আঁচড় না-লাগিয়ে। ওই শুঁড় দিয়ে ওরা-যে মাটিতে পড়ে-থাকা পয়সাও তুলতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছ। তাই একটা চশমা তোলা কোনও ব্যাপারই নয়! বাঘমশাই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। যেন মনে মনে বললেন, 'যত্তসব!'

হাতিদের নিয়ে ঘটনার কোনও শেষ নেই। তবে নানান ঘটনার ঘনঘটায় আজকাল হাতিদের অবস্থা খুব খারাপ। বনে-জঙ্গলে তাদের খাবার ফুরিয়ে আসছে। তাই দলবেঁধে খাবার খুঁজতে মানুষের বসতি এলাকায় এসে পড়ে। ধান গম ভুট্টা আখ বাজরা ফল সবজি ইত্যাদি ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখনই মানুষের তাড়া খায়। যখন তীর-বল্লম দিয়ে ওদের আমরা আঘাত করি, আগুনের ছ্যাঁকা লাগাই, ওরা ক্ষেপে উঠে আক্রমণ করে। আমাদের ঘরবাড়ি ভাঙে। আমরা বলি, 'ওরা পাগল হয়ে গেছে।' ওদের গুলি করে মেরে ফেলি! আমরা যে সভ্য, সবচাইতে বুদ্ধিমান প্রাণী!

রেললাইন পার হয় যখন হাতির দল, তখন বড় বড় রেলগাড়ি দিয়ে আমরা ওদের পিষে মারি। বড় বড় বাঁধ তৈরি করে জল আটকে হয় ওদের জলাভাব সৃষ্টি করি, নয়তো ওদের বিচরণক্ষেত্রকে ডুবিয়ে দিই। বড় বড় রাস্তা তৈরি করে হাতিদের চলাচলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই। আবার আমরাই মহা সমারোহে গণেশ পুজো করি! ভক্তি ভরে আশীর্বাদ চাই। না, প্রকৃতি আমাদের এই আচরণকে ক্ষমা করবে না।

আমি যখন বন্যপ্রাণী বিষয়ক বই কিনেছিলাম, তখন প্রথম বইটা ছিল 'এলিফ্যান্টস'। হাতিদের বিষয়ে অনেক কিছু জানার আগ্রহ ছিল। বই পড়তাম, টিভিতে অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক, ডিসকভারি, বি বি সি ইত্যাদি চ্যানেলগুলো দেখতাম। হাতিদের বিষয়ে যত জেনেছি, তত আশ্চর্য হতে হয়েছে! হাতিদের প্রেমে পড়ে গেলাম।

একবার কোনও একটা ছবির শুটিং পড়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া হল না। দু'-দিন বাদে এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম—একটা জঙ্গলের ভেতর একটা

করবেট পার্কে বুনো হাতি

হাতির পিঠে অন্যদের সঙ্গে সব্যসাচী চক্রবর্তী। জলদাপাড়ার হলং-এ
আলোকচিত্র : গৌরব চক্রবর্তী

ওয়াচটাওয়ারে ক্যামেরা নিয়ে বসে আছি। গভীর রাতে একদল হাতি এলো, কাছেই একটা ডোবা ছিল। সেখানে দুটো বাচ্চা হাতি জল ছেটাতে লাগল আর কাদা মাখতে থাকল। আমি ফোটো তুলতে লাগলাম। হঠাৎ মা-হাতিটা আমাকে দেখে ফেলল। চিৎকার করে সবাইকে বলল, 'পালাও, পালাও! মানুষ!' সবাই পালাতে আরম্ভ করল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'যেও না, যেও না। আমি কারও ক্ষতি করব না। শুধু ছবি তুলব!' মা-হাতিটা দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'আমরা চিত্রতারকাদের সঙ্গে কথা বলি না। উই ডোন্ট টক টু সেলিব্রিটিস!' এই বলে পুরো দলটা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবলাম : তাহলে কি আমার সিনেমা বা টিভির কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত?

এখনও তা করিনি। তবে হাতিদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি—সেই রাতে দেখা স্বপ্নটা যেন মিথ্যে হয়।

নামাঙ্কন : অমল চক্রবর্তী। আলোকচিত্র : সব্যসাচী চক্রবর্তী

৩

১৯৭৫ সালে লালমোহনের চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। চুল সব উঠে গিয়ে মাথার মধ্যিখানটা জুড়ে মস্ত একটা টাক! ঘাড়ের কাছে আর কানের পাশে সামান্য কিছু চুল অবশিষ্ট। সে কি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনির নিত্যিনতুন প্লট খুঁজতে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলার জন্য?

লেখাটাকে পেশা হিসেবে নেবার পর, এই প্রথমবার পুজোয় তাঁর কোনও উপন্যাস বেরোল না। আগে হলে এ-বই সে-বই থেকে খামচে নিয়ে, তার ওপর কিছুটা রঙ চড়িয়ে, যা-হোক কিছু-একটা খাড়া করে দিতেন। কিন্তু ফেলুদার কাছে ক্রমাগত ধরা পড়ার পর চুরিবিদ্যার পথও বন্ধ। তাই ফেলুদার বাড়ি এসে আড্ডা মেরে ব্রেনটাকে শানিয়ে নেওয়া ছাড়াও, খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে রহস্যের গন্ধ-মেশানো ঘটনার হদিশ পাবার চেষ্টা চালিয়ে যান।

হঠাৎই চোখে পড়ে বারাণসীতে মছলিবাবার আবির্ভাবের খবর। সঙ্গে সঙ্গে পেপার কাটিং নিয়ে ফেলুদার বাড়ি গিয়ে কাশী ভ্রমণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করলেন। গড়পারে প্রতিবেশী পুলক চট্টোপাধ্যায়ের ভায়রাভাই নিরঞ্জন চক্রবর্তী 'ক্যালকাটা লজ'-এর ম্যানেজার। সেখানেই তিনজনের থাকার ব্যবস্থা। ১৯৫০-এর পর বেনারসে এই তাঁর দ্বিতীয়বার আসা। তবে এবারের কাশীভ্রমণ তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। এখানেই ফেলুদার জীবনের সবচাইতে ধুরন্ধর আর সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মগনলাল মেঘরাজের সঙ্গে মোলাকাত। বুদ্ধি আর গোয়েন্দাগিরির দাপটে ফেলুদা মগনলালকে কাবু করতে পারলেও, লালমোহনকে যেভাবে নাকানিচোবানি খেতে হল, সেই স্মৃতি জীবনে ভোলার নয়!

মগনলালের ডেরায় দেয়ালে হেলানো অবস্থায় খাড়া-করা একটা বড় তক্তার সামনে লালমোহনকে দাঁড় করিয়ে, নাইফ থ্রোয়িং-এর মতো রক্ত-হিম-করা খেলার ক্যারামতি দেখাল মগনলালের পোষা খেলোয়াড় অর্জুন—আগে নাকি কোন্ সার্কাসে এ-সব খেলা দেখাত। ভয়ে আর আতঙ্কে (নিজেরই হিসেব-মতো) লালমোহনের আয়ু কমে গিয়েছিল অন্তত তিন বছর। খেলা শেষে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জীবনের এমন বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল, 'বেঁচে থাকলে... পপ্-প্লটের আর চি-হিহিন্তা নেই।'

ফেলুদাকে নিজের ডেরায় পেয়ে মগনলাল চেয়েছিল গোয়েন্দাবাবুকে একটু জব্দ করতে। আর সেটা করেছিল লালমোহনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। এত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহ্য করার পরও ফেলুদার ওপর কোনও রাগ বা ক্ষোভ ছিল না জটায়ুর। বরং কাতরস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তাঁর মাথার সব চুল পেকে গেছে কিনা! সহজ মানুষটা পরিবেশের শিকার হন, চাপ সহ্য করেন, কিন্তু মন তাতে একটুও বাঁকা পথে চলে না। বন্ধুত্বে চিড় ধরে না।

মগনলাল মেঘরাজের বাড়ির অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর এবং হাড়কাঁপানো হলেও, জটায়ুর প্রকৃত মনোবেদনার কারণ ঘটেছিল অন্য একটা ক্ষেত্রে। ঘোষালবাড়ির ছেলে রুকুর মুখে গড়গড় করে অক্রুর নন্দীর গোয়েন্দা ক্যাপ্টেন স্পার্কের ডায়লগ মুখস্থ বলতে শুনে ঘোর অস্বস্তি—পাছে ফেলুদা আর তোপ্‌সের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তার গুমোর নষ্ট হয়ে যায়! তাহলে কি রুকুর কাছে প্রখর রুদ্রের চাইতে ক্যাপ্টেন স্পার্কের প্রভাব বেশি? আমরা জানি, তাঁর বানানো গপ্‌পোর হিরোর কোনও অসম্মান তিনি সহ্য করতে পারেন না। এমনই অহংকার! পরে রুকুর ঘরে বইয়ের তাকে নিজের লেখা বই 'রক্ত-হীরক রহস্য' দেখে কিছুটা ইয়ে হয়েছিলেন।

লালমোহনের নোটবই ঘেঁটে আমরা দেখেছি—বেনারসে থাকাকালীন তিনি অনেকবার তাঁর পরের উপন্যাসের ছক কাটার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনওটাই শেষপর্যন্ত বেশি দূর এগোয়নি। সে-বছর পুজোয় তাঁর কোনও বই বেরোয়নি। তদুপরি রুকুর ওপর অক্রুর নন্দীর প্রভাব দেখে, তিনি আর-কোনও ঝুঁকি না-নিয়ে, প্লটের জন্য বেশি চিন্তাভাবনা করে সময় নষ্ট না-করে, টিনটিনের একটা কমিক্‌স-বই থেকে সোজাসুজি টুকে পরের উপন্যাস দ্রুত লিখে ফেলেন।

লালমোহনের অনেক দিনের স্বপ্ন তাঁর কোনও গল্প নিয়ে হিন্দি ছবি হোক। তাঁর লেখার ধরনধারণও হিন্দি ছবির পক্ষে লাগসই। ১৯৭৬-এ তাঁর গল্পের প্লটকে হিন্দি ছবির পক্ষে আরও মোক্ষম করে তোলার জন্য তাঁকে কোমর-বেঁধে লাগতে দেখা যায়। গড়পার রোডের প্রতিবেশী পুলক ঘোষাল তখন বোম্বাইয়ের ফিল্মিজগতে হিট ডিরেক্টর। তাকে অ্যাপ্রোচ করা যাবে—এই চিন্তা মাথায় রেখে পরের উপন্যাসটা শুরু করেন। কিন্তু তিনটে পরিচ্ছেদ লেখার পর আটকে গিয়ে ফেলুদার কাছে এলেন পরামর্শের জন্য।

ফেলুদা হিন্দি ছবির ফরমাশ-মতো তাঁকে আইডিয়া দেয়—ডবল রোলের বদলে জোড়া ডবল রোলের। তাছাড়া হিরে, গাঁজা, চরস, সোনা—এ-সবের স্মাগলিং। পাঁচটা গানের সিচুয়েশন, তার মধ্যে একটা ভক্তিমূলক। দুটো নাচ, খানতিনেক চেজ সিকোয়েন্স—তাতে অন্তত একটা দামি মোটরগাড়ি পাহাড়ের গা গড়িয়ে পড়ে ধ্বংস। অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য, ভিলেনের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে খলনায়িকা, একজন কর্তব্যবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসার, নায়কের অতীত কাহিনির ফ্লাশব্যাক, কমিক রিলিফ। আর গল্প যাতে ঝুলে না-পড়ে, তার জন্য ঘন ঘন দৃশ্যপট ও ঘটনার পরিবর্তন, এবং শেষে হ্যাপি এন্ডিং। এই ফর্মুলামাফিক লালমোহন ঝাড়া দু'-মাসের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে

পত্রমিতা চাই নাকি ভাই—
পত্রমিতা চাই নাকি?
আমার সঙ্গে ভাব জমাতে
ইচ্ছে আছে, তাই নাকি?
তবে তো ভাই ভালোই হল
দাও চিঠি দাও চট করে।
কোথায় থাকি তাও জানো না—
নাও টুকে নাও ঝট করে!

নামটা যেন ভুল কোরো না
হুঁশ থাকা চাই তখন যে—
নইলে কোথায় গোল বেধে যায়
কেউ জানে না কখন যে!
তবে তেমন চাই না জবাব
যে-সব শুধু দায়সারা
আজকে তাদের শুভেচ্ছা দিই—
পত্রমিতা চায় যারা।

কার্তিক ঘোষ
সন্দেশ। গ্রীষ্ম সংখ্যা
১৩৭৯/১৯৭২

পত্র-বন্ধু হতে চাই

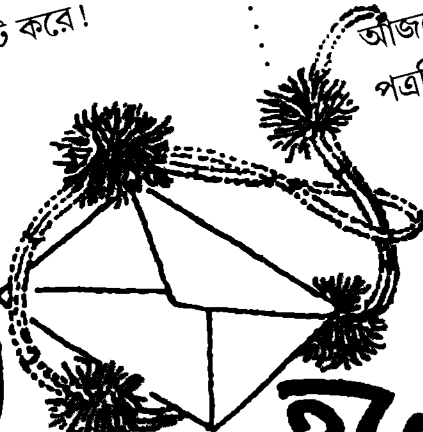

সোমনাথ দাশ। ১৪ বছর
নবম শ্রেণী। সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন ফর বয়েজ
শখ : বইপড়া—বিশেষ করে রহস্য গল্প-উপন্যাস —ফেলুদার একনিষ্ঠ ভক্ত, পত্রবন্ধুত্ব।
৪/৬ রামচরণ শেঠ রোড। হাওড়া। ৭১১১০৪

চৈতালি রায়। ১৩ বছর
অষ্টম শ্রেণী। নববারাকপুর উপনিবেশ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শখ : সায়েন্স-ফিকশন ও ক্রাইম-ফিকশন ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়া, সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখা, রবীন্দ্রসংগীত শোনা ও গাওয়া।
১৩ রবীন্দ্রপল্লি। ডাকঘর রবীন্দ্রনগর
দুর্গানগর। কলকাতা ৭০০০৬৫

অঙ্কিতা দেবনাথ। ১৫ বছর
নবম শ্রেণী। তারাসুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শখ : গিটার বাজানো, পুরনো দিনের ইংরেজি বাংলা হিন্দি গান শোনা, বইপড়া—বিশেষ করে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ।
৪২/২ জওহরলাল নেহরু রোড
নবদ্বীপ। নদিয়া। ৭৪১৩০২

পদ্মনাভ সেনগুপ্ত। ১৩ বছর
সপ্তম শ্রেণী। হিন্দু স্কুল
শখ : বইপড়া, ছবি-আঁকা, সাইকেল চালানো, গাছের পরিচর্যা করা।
বি ১০২। 'বেলাশেষে'। শান্তিবন হাউসিং কমপ্লেক্স
৭ উমাকান্ত সেন লেন। কলকাতা ৭০০০৩০

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

হাতে পাকাবার

কম্পিউটার পেন্টিং: ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাপতি

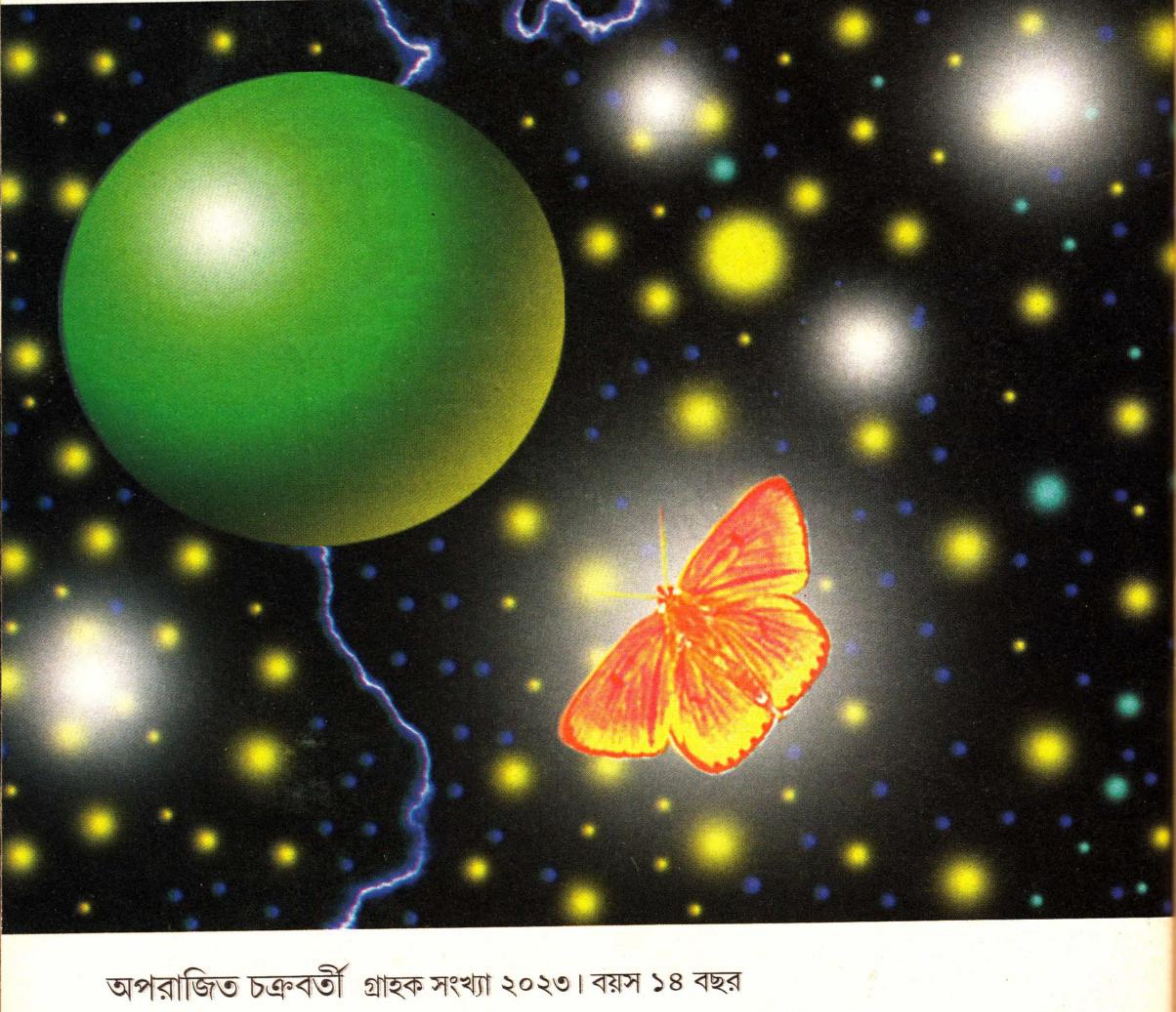

অপরাজিত চক্রবর্তী গ্রাহক সংখ্যা ২০২৩। বয়স ১৪ বছর

আসর

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

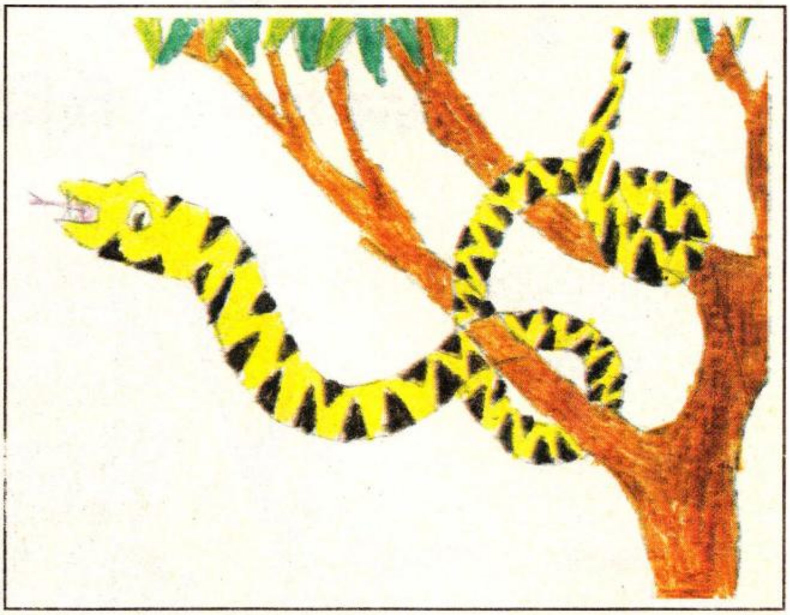

সায়র বসু
গ্রাহক সংখ্যা ৪২৮৮
বয়স ৭ বছর

অনির্বাণ ত্রিবেদী
গ্রাহক সংখ্যা ৪৬৩২
বয়স ৯ বছর

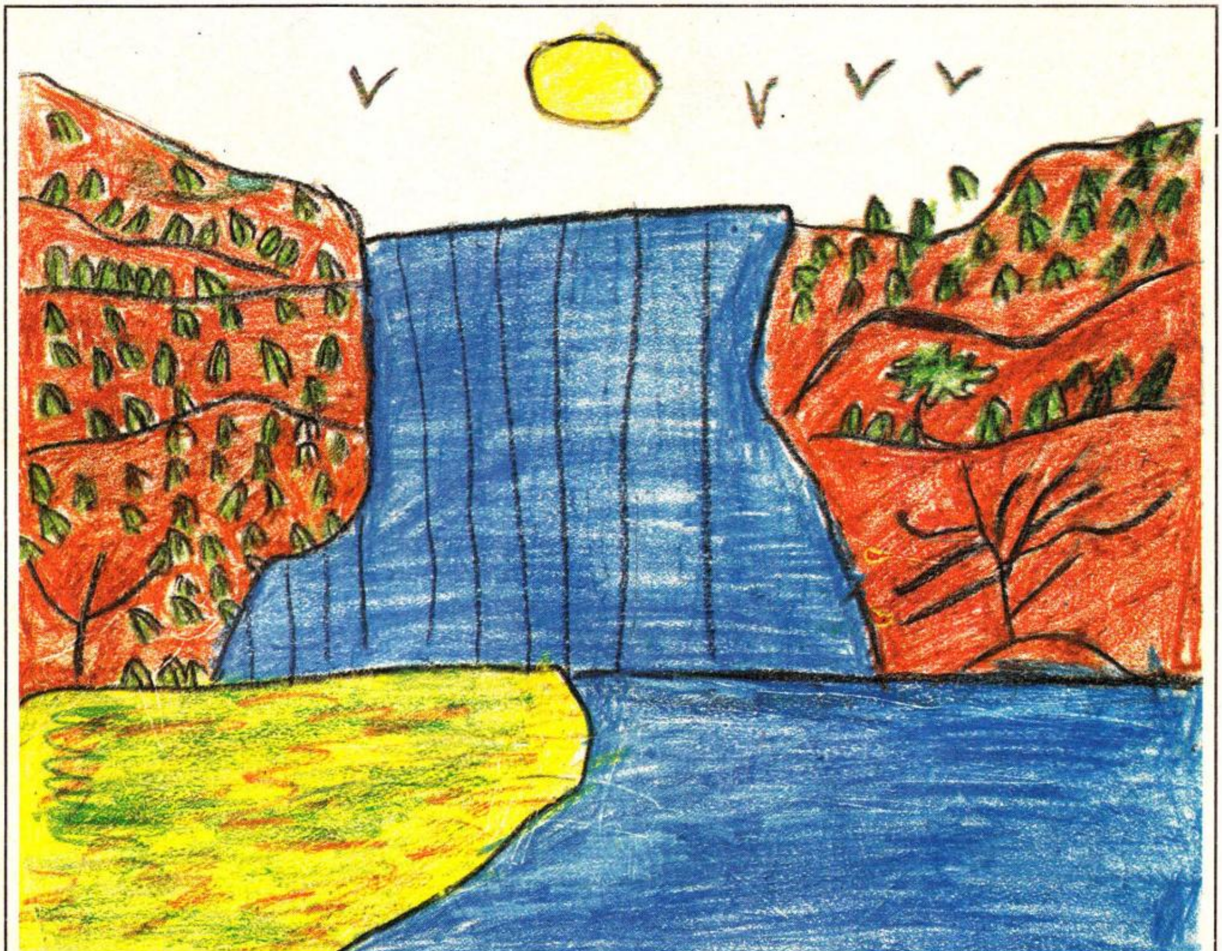

শব্দজব্দ

রেবন্ত গোস্বামী

একটা মাস পর পর—কেমন লাগছে জানিও। হোঁচট খাবার আগেই বাপু শব্দকোষটা আনিও।

পা শা পা শি

১। জননী এলেন দ্বারে, দু'-দল দু'-দিকে,
এই নামে চেনে লোকে সে-কামানটিকে।

৪। জমা করে রাখে তারা চাল গম চিনি,
ভালো লোক নয় বলে তাকে সবে চিনি।

৮। মাথা বাদে নকল যে নেপালের চাকু,
ফেলুদাকে দেখালেন লালুবাবু টাকু।

১০। এমনিতে সেই জন অতি দুর্বল,
আধখানা নিয়ে গেছে খেলোয়াড়দল।

১১। সুবাসের রাজা নামে চেনা এই ফুল,
সে-নাম পেল না জুঁই গোলাপ বকুল।

১৩। বর্ষাকালের হলুদ ফুল, গন্ধে মাতোয়ারা—
দু'-বার ফেলে এগিয়ে চলে নেতাজির সেনারা।

১৬। 'শ্রীকান্ত' বইয়ে তার বড় বড় বাত,
কুকুরের তাড়া খেয়ে হল কুপোকাত!

১৮। শ্রেষ্ঠ, তিলক, অলংকার।
এই শব্দ চেনা কার!

১৯। রেফ নয়—নীচে তারই দর্পণ-রূপ,
দেখেও দ্যাখো না তুমি। থাক্ তবে, চুপ।

২১। যে বৃক্ষ গাত্রবস্ত্র—গাঁয়ের আগেতে
এলে শোওয়া বসা একই, তবু শোন রেতে।

২২। এ-দেশের মাথা গেলে কী হয় তা জানো?
ছেঁড়া কাপড়েতে দেয়, শাবাশ জানানো।

২৫। আসলেতে মানে এর করা যে হরণ,
নিরাকার পুচ্ছ হলে শিব পঞ্চানন।

২৬। এমনিতে অব্যয়, শব্দ অনুকার—
দ্রুত সরে যাওয়া আর পিছলে পড়ার।

২৭। জগতে এত-যে ফল, নাম আছে কার
রসাল, অমৃতফল—শাখা সহকার?

২৮। পেট কেটে কদলী বা অল্প ল্যাজ কেটে,
কোন ফল লক্ষ্মীরঙ, বলো মাথা খেটে।

২৯। আজকের আগে আর পরে—দুই-ই হয়,
আলাদা ভাবেতে এটা বোঝায় সময়।

৩০। আগে কণ্ঠ, পরে সরু পথ শহরের,
এমনই ঘনিষ্ঠতা, কী-যে বহরের!

৩১। আদিতে অর্থ ছিল অপর বা অন্য
এখন চলিত মানে নিচ ও জঘন্য।

৩৩। এটাই দেখতে লোকে যায় দলে দলে
পুরী বা মাহেশ অথবা মহিষাদলে।

৩৫। এটা নিয়ে হইচই করে শিবরাম,
গাছে তুলে কেড়ে নেওয়া? ও-যে বুঢ়া কাম।

৩৬। নামটি তো সুন্দর, আগেতে পানীয়,
'নষ্টনীড়' গল্পের নায়িকা জানিও।

৩৭। এটা ছাড়া খোলে না যে বদ্ধ দুয়ার,
গানেতে সেটাই ভেঙে ঘর থেকে বার!

৩৯। ফুলের কুঁড়ি যখন হয় চুনকাম,
তখন সে আরও হয় যুগের এক নাম।

৪০। অর্থটা অবশেষ বা অতিরিক্ত,
ওলটালে অব্যয়—জানো তুমি ঠিক তো?

৪১। রথের ভেঁপুর রব এবং বাতাসে
মাথাছাড়া অপরের গন্ধ ভেসে আসে।

৪২। এ-দু'টিকে একসাথে করো নিয়ন্ত্রণ—
দেহ-চিত্ত। তবে ঠিক হবে যোগাসন।

৪৩। টি-টা যোগে কতিপয়, প্রশ্নে কতগুলি,
'কহে'—কিছু অঞ্চলের মানুষের বুলি।

৪৪। বিষ্ণুর অবতার, গুটি গুটি চলে,
ল্যাজ ছাড়া ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে।

৪৫। উঠতে পারে না নিজে, পরনির্ভর,
উলটে ভাদ্রে পড়ে মাটির ওপর।

৪৬। সাহেবি রূপে এ-সাপ বিষদাঁত ধরে,
দুইয়ে-তিনে এলোমেলো ছত্তিশগড়ে।

৫০। বন্ধু, সুহৃদ, সখা—যা পদবি হয়,
এটা তারই অপভ্রংশ স্ত্রী-নামেতে রয়।

৫১। শেষ বাদে যাহা থাকে অগ্রভাগে,
তাকে কি জ্বালানো যায় এমন রাগে!

৫৩। বিশেষণ দিতে পারো সেই মেয়েটাকে,
শরমে জড়িত হয়ে সদাই যে থাকে।

৫৫। প্রাচীন এ-দেশ অশান্ত আজ, প্রত্যহ খবরে—
শেষটা বাদে জগৎ ছাড়াও অনেক অর্থ ধরে।

৫৮। অর্থটা দমিত, বা পিষ্ট, নিপীড়িত,
জাতপাত রাজনীতি করে পরিচিত।

৬০। পিতৃব্যের আদুরে নাম, তারই থিওরি,
কাকুতি মিনতি হয়—হাতে পায়ে ধরি।

৬১। এ-সময় চলে আসে রাত্রির পর,
দ্বিগুণে বা সাত-আগে আরও সত্বর।

৬৩। মাপিবার মাত্রা-কন্দ, আর পঞ্চানন
সম্মান বা অহমিকা করিল হরণ।

৬৪। কানের দু'-পাশে দেখি কাকের ডানা—
এ-শব্দ অনেকেরই ছিল না জানা!

৬৫। গানেতেই শুধু দেখি নেচে যায় তারা,
চেহারাতে রূপ নেই—শকুনের পারা।

৬৬। ব্রহ্মপুত্র, দামোদর, সিন্ধুর দল—
বলো দেখি তাড়াতাড়ি, এরা কী-সকল?

৬৭। জলজীবটার আঁধার সেই তো ঘোচালো—
বিশেষণ তাই পেল সূর্য বা আলো।

উ প র - নী চ

১। শ্বাসের শক্তির জোর যন্ত্র নিয়ে চলে,
আগুন নেবাতে হবে ছুঁড়ে-দেওয়া জলে।

২। জোড়া-শব্দে একই মানে—টান যে মনের
তাই মাতা থাকেন দু'-পাশে দু'জনের।

৩। রামপুত্র জয়ঢাক—একসাথে চলা,
অর্থ ঘোড়ার ডিম, আর কাঁচকলা।

৪। বৃক্ষকে বলে। হেতু, পৃথিবীতে জাত,
মাঝে আছে ছন্দের একটা ডাকাতও।

৫। খ্রিস্ট সনের মাঝে এটা এক মাস—
মাথায় কর্কট-রবি, দেহ হাঁসফাঁস।

৬। সাবানে কি ওঠে যদি মোক্ষম পড়ে?
উলটিয়ে তাই বুঝি ভীম হাতে ধরে।

৭। আগেতে রসুই আর পরেতে শ্যালক,
এ-ঘরই তো যোগসূত্র পাচক ও ভক্ষক।

৮। বারে বারে মুখে পোরো আহারের কালে,
তবে সহবত নয় রাখা ফোলা গালে।

৯। এমন পাত্রে সব জলই চুঁয়ে পড়ে,
উলটে ফুটবে ফুল যদি এটা ধরে।

১২। প্রথম হরফ পালটে এই রঙ রাঙা
কখনও পাগল হয়, কখনও-বা মামা।

১৪। তেলা দেহে করতেন দারা সিং, গামা—
প্রথম আধখানা জুড়ে বিখ্যাত লামা।

১৫। একে-দুইয়ে শেষ, তিন এলে থাকে গানে,
সব মিলে নেপথ্য—শব্দের মানে।

১৭। প্রথম দুইয়েতে মূল্য, শেষ দুইয়ে শব,
বলদ? না—বুড়োধাড়ি অকম্মা সব।

২০। এর শাখাতেই মঙ্গলঘট অলঙ্কারে সাজে,
শেষে এলে দীর্ঘ-ঈকার সাহায্য সব কাজে।

২৩। সরু কৃশ হবে যে, তা এতে নেবে চিনে,
মাঝে কুঁড়ি, একই পাবে একে আর তিনে।

২৪। হাঁটুতে দুধের সর, তার সাথে জাঁতা—
ভাঙলে সারানো যে তা—নহে কাজ যা-তা।

২৭। সব মিলে আসা, কিন্তু মাথা কাটলেই যাওয়া,
আধা কাটলেই শেষ খণ্ডে চিত্ত যাবে পাওয়া।

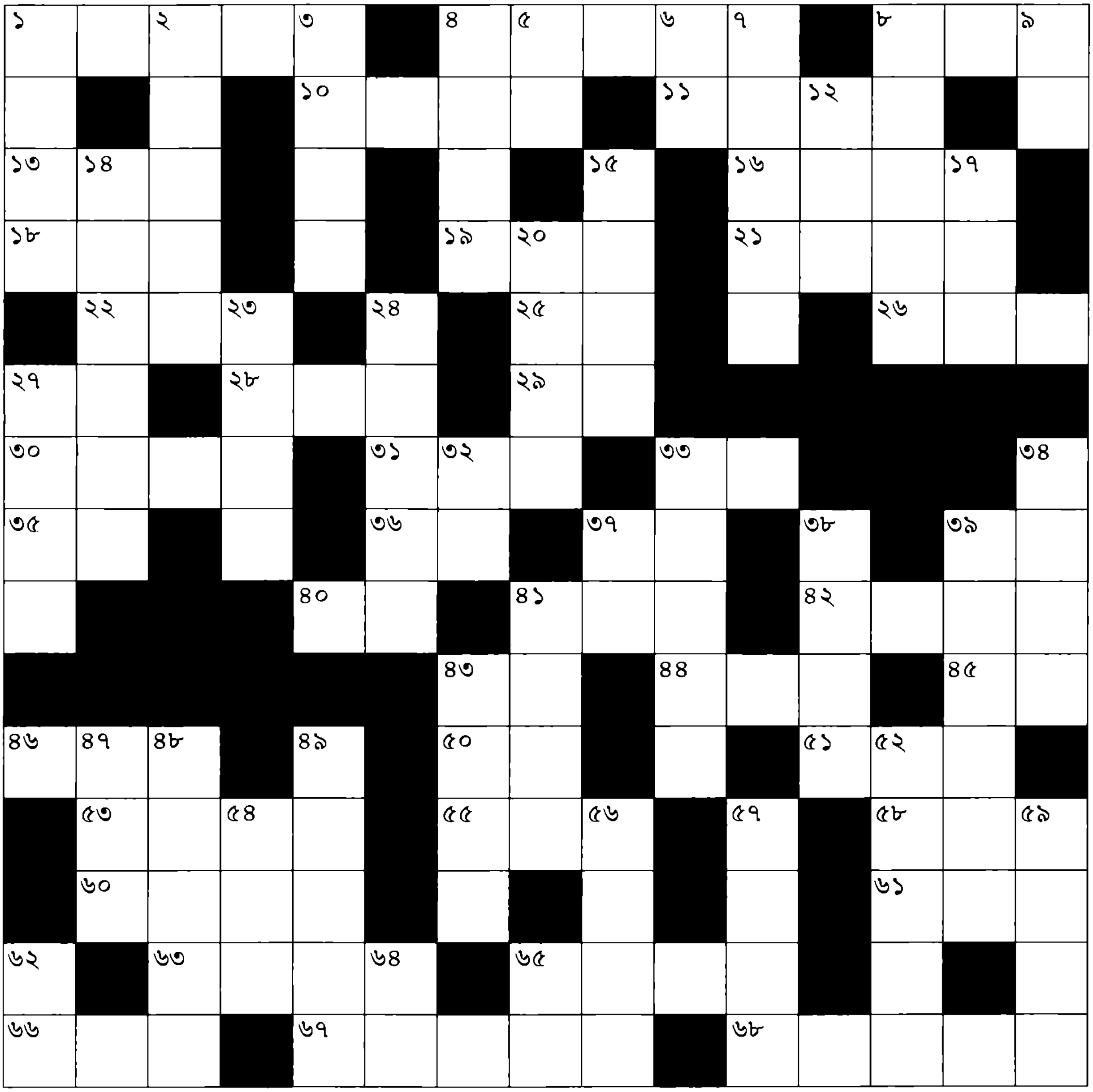

৩২। বৃক্ষ বা গাছ যা-ই বলি না—
সেটাই এতে কোমল ধরণ,
এর আগেতে কল্প এলে
সব বাসনা করবে পূরণ।

৩৩। এক সকালে এমন কিরণ কবিগুরুর প্রাণে
লেগে ঝর্নার ভাঙল স্বপন প্রভাত পাখির গানে।

৩৪। মনের কোণের সব দীনতা আর কী ধুতে হবে?
যা হলে এই আলোকধারায় মন নির্মল রবে?

৩৭। বিলাতে প্রেশার বলে। বায়ু, জলে আছে—
কাজে আছে, রক্তে আছে—উলটে হাজা মাছে।

৩৮। একশো? না, কম-বেশি? ক'-খানা চরণ?
একই নামে কেন্নো বিছে করে বিচরণ।

৩৯। সুন্দর নামে কবিতায় পাবে পদ্মের কুঁড়িটাকে,
এ-কুঁড়ি আবার মার্জিত রূপে হুঁকোর মাথায় থাকে।

৪১। কেউ কষে কুস্তিতে, কেউ বৃথা কাজে,
শেষ আধায় আকাশে বা নয়নে বিরাজে।

৪৩। হাসতেই যদি চাও, তিন বাদ দিয়ো—
(তিনে 'ই' বাড়তি) বই ছোটদের প্রিয়।

৪৭। ডানা মেলে ওড়ে সেই বকেদের সারি,
রবি-কাব্যের নামে চিনে নিতে পারি।

৪৮। নৃপতিনন্দিনী ইনি অন্য নামে,
সোনার কাঠিতে যাঁর নিদ্রা ভাঙে।

৪৯। জঘন্য যে দক্ষকন্যা দহন রেওয়াজ,
দূরীভূত করা রামমোহনেরই কাজ।

৫২। পা ফেলা, প্রবেশ কিংবা আবির্ভাব ধীরে,
মুড়োল্যাজে নয় আপন, তিনে পাঁচে ক্ষীরে।

৫৪। সিরাজ বা আলিবর্দি যা ছিলেন সবে,
উলটিয়ে এই রূপ সবারই তো হবে।

৫৬। বানরযন্ত্র এক—কোকিল মাঝেতে,
ঘোরে, আর দড়ি নামে কূপোদক পেতে।

৫৭। নাফা আর লোকসান—এতেও তা বলে,
এটা ছাড়া ব্যবসা কি এমনিতে চলে!

৫৯। একেবারে জল নিম্নে আছে—সেই দেশে
ডুবুরিরা চলে যায় অতি অক্লেশে!

৬২। দক্ষিণের উলটোদিক—উত্তর নয়,
বিধি যদি হয় এটা, পাবে পরিচয়।

৬৪। স্থগিত বা বন্ধ, যা উলটিয়ে মূল্য,
আগে যদি 'না' আসে তো কলহে প্রফুল্ল।

৬৫। দ্বিজ, তবু পৈতে নেই। কৃষ্ণ—নয় কানু।
ঘর ছাড়া, ঘরে ফেরা ঠিক করে ভানু।

নামাঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

জানুয়ারি সংখ্যার সমাধান

			স		ছা				প		আ		কাঁ	
	চ	কো	র		না	স্তা	না	বু	দ		বো	ল	চা	ল
	ডু		গ		ব		গ		কা	জ	ল		পা	
	ই	মা	ম	বা	ড়া		কে	য়ূ	র		তা	ল	কা	না
	ভা						শ				বো			
জা	তি	ভে	দ		স	ব	র	ম	তী		ল	ব	কু	শ
			শ		চে				র্থ				সু	
	আ	লো	ক	পা	ত				স	র	গ	র	ম	
	র				ন				লি		য়			
অ	বি	ক	ল		তা	জ	ম	হ	ল		না	শ	পা	তি
			ং				রা						রু	
নী	হা	রি	কা		তা	মি	ল		হ	য	ব	র	ল	
	রা		বি	ন	ম্র		গ্রী		স্তা		র		বো	
ম	হা	রা	জ		কৃ	র্মা	ব	তা	র		বা	ম	ন	
	রি		য়		ট				ক		দ			

অনিরুদ্ধ দেব

মনের কথা কই

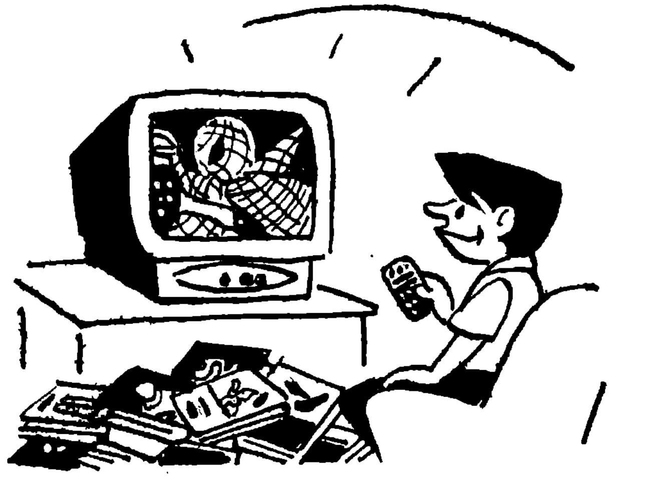

আমার গত মাসের লেখাটা বেরোবার পর কিছু চিঠি এসেছে, বেশিরভাগই বড়দের! তোমাদের অভিভাবকরা অনেকে মনে করছেন: চিঠিপত্র লিখবে কখন, তোমাদের সময়ের বড় অভাব! তার জন্য দায়ি ইশকুলের পড়াশোনার চাপ! কিন্তু ভেবে দ্যাখো তো—তোমাদের সময়ের অনেকটাই কি খেয়ে নিচ্ছে না একটা সাদামাটা বাক্স? যিনি সকলের সময় খেয়েই বেঁচে আছেন!

তাঁর নাম টেলিভিশন। 'টেলিভীষণ'-ও বলতে পারো!

এই সাংঘাতিক যন্ত্রটার সঙ্গে মা-বাবাদের মারামারি আকছার দেখছি। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি—এতই যদি খারাপ, কেন এটাকে পুষে রাখি? কেন দূর করে দিই না আমাদের জীবন থেকে? এই সর্বনাশা মারণযন্ত্র সাধ করে কিনে বাড়ি সাজাই। আর বাড়ির ছোটরা যদি সেটা হরদম ব্যবহার করে, 'গেল গেল' বলে হাহাকার করি! কী আশ্চর্য!

সেই হিসেবে দেখতে গেলে তো আমরা যদি গল্পের বই পড়ি বা সিনেমা দেখতে যাই বা ইশকুলের পড়াশোনা বাদ দিয়ে যা-ই করি, সময় নষ্ট! কেন শুধু টিভিকেই দোষারোপ?

ক'-দিন আগে মুম্বাই গেছিলাম। দিনের কাজ শেষ করে কিছুই করার থাকত না, হোটেলের ঘরে টিভি খুলে এটা-সেটা দেখতাম। কলকাতায় টিভি বিশেষ দেখি না। কিন্তু ওখানে একদিন খেয়াল করলাম—টিভি বন্ধ করে শুতে যাচ্ছি, তখন রাত দুটো! পরদিন কাজের জায়গায় অনেকেই শুধোলেন, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

সময় নষ্ট করার যত রাস্তা আছে, তার মধ্যে একজন বড় আসামি হচ্ছেন টিভি। টিভি যখন ছিল না, তখন যাঁরা ছোট ছিলেন—তাঁরা কি সময়ের অপচয় করতেন না? তাঁদের বাবা-মায়েরা কি তোমাদের বাবা-মায়ের মতো 'সময় নষ্ট করিস না, করিস না—' বলে হইচই বাধাতেন না?

আমরা যখন ছোট ছিলাম, সময় নষ্ট করার জন্য যা-যা পাওয়া যেত, আজকের একশোটা চ্যানেলের টিভির মতো সেগুলো এত লোভনীয় ছিল না। সময় নষ্ট করার জন্য আমরা দারুণ সব বই আর ম্যাগাজিন পড়তাম, কী ভালো-ভালো সিনেমা দেখতাম, মাঝে-মধ্যে রেডিয়ো শুনতাম, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। কিম্বা চুপচাপ বসে আকাশপাতাল ভাবতাম! ভাবাটাও প্র্যাকটিস করতে হয়।

এইসব সময় নষ্ট করার জিনিসের সময় নষ্ট করার ক্ষমতা ছিল কম। লীলা মজুমদারের 'বাতাস বাড়ি' পড়া হয়ে গেলে, আর-একটা দারুণ বই হাতে-পাওয়া অব্দি সময় নষ্ট করতে পারতাম না! সিনেমা দেখতে অনেক প্ল্যান করতে হত, টাকা জমাতে হত (নয়তো মা-বাবার কাছে চাইতে হত, এবং যখন-তখন পাওয়া যেত না)! রেডিয়োতে হাতে-গোনা স্টেশন, খুব-যে দিন-রাত শোনার যুগ্যি ছিল, তা-ও নয়। ব্যাডমিন্টন কি ফুটবল খেলা বা আড্ডা মারাটাও সন্ধের আগেই শেষ করতে হত!

টিভির কোনও শেষ নেই! একশোটা চ্যানেল, চলছে তো চলছেই! এখানে সিনেমা, ওখানে গান নয়তো সিরিয়াল, সেখানে খবর... চ্যানেল ঘোরালেই, বেশ মন দিয়ে (বা না-দিয়ে) দেখা যায়—এমন একটা অনুষ্ঠান ঠিক পেয়ে যাবে। সিনেমা দেখার জন্য বাবা-মায়ের কাছে পয়সা চাইবার প্রশ্ন নেই। বন্ধুদের সঙ্গে ইচ্ছেমতো আড্ডা দেবার অবস্থাও নয়। তোমার মন না-চাইলেও, বোতাম টিপে গান-কে খবর, খবরকে সিনেমায় বদলাতে পারো। টিভি বড়ই সুবিধের সঙ্গী।

আর এইজন্যই টিভি সময় খেয়ে নেয়। একটু দেখে নিয়েই অন্য কিছু করব থেকে পরিস্থিতিটা এমন হয়—কিছু বোঝার আগেই পাঁচ মিনিট হয়ে দাঁড়ায় তিন ঘণ্টা!

যে-কোনও ক্ষমতাশালী জিনিসকে যদি ঠিকমতো চালানো যায়, অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষমতাশালী জিনিসটা কি আমি চালাচ্ছি, নাকি আমার হাতে রিমোট-কন্ট্রোল থাকলেও, যন্ত্রটা আমাকে চালনা করছে? আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনা করার সময় কমিয়ে দিয়ে কি যন্ত্রের মতো ভাবতে শেখাচ্ছে?

নামাঙ্কন : দেবাশিস দেব

অলঙ্করণ : অমল চক্রবর্তী

রাজশ্রী রাহা

কুট্টি

দু'-চোখে জল নিয়ে, দু'-হাতে কুট্টির নিথর দেহটা নিয়ে ঝমরু দাঁড়িয়ে আছে দেবতার সামনে। পুরুতমশাই বললেন, 'বল বাবা বল, মায়ের কাছে যা চাওয়ার, চেয়ে নে এইবেলা। মনস্কামনা পূর্ণ করে নে।'

ঝমরু কাঁদছে। দু'-চোখে জলের স্রোত অবিরাম। ছুট্‌কী দু'-চোখ বুজে হাতজোড় করে কী-যেন চাইছে। চাইবে না-ই বা কেন? চাওয়ার জন্যেই তো পুজোটা করা। পুজো করবে, বলি দেবে, তবে-না মা খুশি হয়ে সোনার চাঁদ ছেলে দেবেন। কিন্তু কুট্টি কেন? ভাবতেই দু'-হাতে ধরা নিথর দেহটার দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল ঝমরু।

ঝমরুর পোষা ছাগল বিম্‌লির প্রথম ছানা কুট্টি। এই শীতে এক বছর হত। ঝমরুর বড় আদরের। সবসময়ে পায়ে পায়ে ঘুরত। কুচকুচে কালো লোমে ঢাকা শরীরে সজল চোখ-দুটো কী বাঙ্ময়! ভারী প্রাণবন্ত ছাগলছানা। সবসময় লাফাচ্ছে। যেন সারা দিনটাই খেলার সময়!

নয়-নয় করেও ঝমরুর চার বিঘে ধানি জমি আছে। সারা বছর গোলা-ভরা ধান। ঘরের সামনের জমিতে যা সবজি হয়, তাতে সম্বচ্ছর খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না। দুধেল গাই রামী আর গোপীর দুধ বিক্রি করে পরার চিন্তাও এখন-আর করতে হচ্ছে না। মোটমাট, গ্রামের মধ্যে বর্ধিষ্ণু না-হলেও, সচ্ছলই বলা যায় ঝমরু-ছুট্‌কীর পরিবারকে।

অভাব একটাই। ভাতের হাঁড়ি নামানোর সময়ে কিম্বা চান করে পুজোঘরে যাওয়ার সময়ে কাদামাখা-গায়ে 'মা' বলে ছুট্‌কীর গলা জড়িয়ে ধরার মতো কেউ এখনও আসেনি ঝমরুর পরিবারে। শান্তির কোনও অভাব নেই, তবু ছুট্‌কীর চোখের জলেরও বিরাম নেই। ওষুধ, কবরেজ অনেক হল। শেষমেশ পুরুতমশাই বললেন, 'যজ্ঞ করে, বলি দিয়ে, পুজো দিতে হবে।'

ছুট্‌কী অমনি বলে বসল, 'পাঁঠা বলি দেব।'

'বললি যে বড়—জানিস তুই, পাঁঠাবলির হ্যাপা কত!' পুরুত বললেন, 'যে-সে পাঁঠায় হবে না। পাঁঠার রঙ হতে হবে কুচকুচে কালো, চকচকে। আলো-আলো গা, নধর, পুরুষ্টু।'

বলবার সময়ে ঠাকুরমশাই কি কুট্টির দিকে আড়নয়নে চেয়েছিলেন? মনে নেই ঝমরুর। ভাবেওনি তো তখন। এমনটা হবে, ছুট্‌কীও কি ভেবেছিল?

পাশের বাড়ির হরিশখুড়ো তখনই বলেছিলেন, 'দেখেশুনে লাগসই একখানা পাঁঠা কিনে বাড়িতে রাখ। ছ'-মাস পরে সময়মতো যদি না-পাস?'

ঝমরু হেসেছিল, 'কী-যে বলো খুড়ো, ছ'-মাস ধরে পাললে পুষলে, মায়া পড়ে যাবে না? ঠাকুরের কৃপায় পেয়ে যাব বই কী।'

হতাশ হরিশখুড়ো নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা যা ভালো বুঝিস...' কথা শেষ না-করেই উঠে পড়লেন।

সব মনে পড়ছে এখন ঝমরুর। এইজন্যই সবাই বলে, 'গুরুজনদের কথা শুনে চলো!'

গাল বেয়ে জল গড়িয়েই যাচ্ছে। মোছার উপায় নেই।

পুরুত বলতে লাগলেন, 'নে। এবার দেবতার সামনে বলিটাকে রাখ।'.

দু'-চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল ঝমরুর। কেন, ওর কি নাম নেই? ও-যে কুট্টি! এক মুহূর্তে নাম পাল্টে হয়ে গেল 'বলি'? পুরুতরা কী করে এত নিষ্ঠুর হয়? বাড়িতে কি ওদের বালবাচ্চা হয় না?

সংযত করল নিজেকে, অতি কষ্টে। 'পুজো ভুল হয়েছে' বলে যদি আবার পুজো করতে বলে? না-না, এতটা নিষ্ঠুর হতে পারবে না ঝমরু। দু'-হাতে ধরা কুট্টির দেহটা নীচে থালার ওপর নামিয়ে রাখল ঝমরু। ছুট্‌কীও হাত লাগাল। হাত নাকি লাগাতেই হয়। দু'জনকেই।

পাশে কুট্টির দেহ থেকে আলাদা হয়ে-যাওয়া মাথাটা পড়ে আছে। সেদিকে একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝমরু। ছুট্‌কী কীরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাথাটার দিকে। স্থির, স্তব্ধ। ওকে দেখে এখন মনে হচ্ছে—সারা পৃথিবীর কোনও শব্দই ওর কানে যাচ্ছে না।

যাক গে, যা-ভাবে ভাবুক। ঝমরু ওকে ডাকবে না। ওর জন্যেই তো এত সব। কুট্টি নেই, সে-ও তো ওরই জন্য! বিম্‌লিটা তখন থেকে ডেকে যাচ্ছে। কুট্টিকে খুঁজছে। ঝমরু এখন ওর সামনে দাঁড়াবে কী করে? সান্ত্বনাই-বা দেবে কী করে? না-হয় অবলা জীব। মন তো আছে! মায়ের মন। সন্তানের বিপদ ঠিক টের পেয়েছে! থাক ছুট্‌কী, দেখুক, আজ ওর জন্য কুট্টি নেই।

শিউরে উঠল ঝমরু। 'কুট্টি নেই' কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল যেন!

অত ফলমূল কলাপাতার গন্ধে বাড়ি তখন ম-ম করছে। বিম্‌লি আর কুট্টিরও কী আনন্দ! যেন বুঝতে পেরেছে—পুজো হবে, নৈবেদ্য হবে। কত লোকজন খাবে। তাও যেন বুঝেছিল! কুট্টির সে কী তিড়িং-তিড়িং লাফ! যেন ওরই পুজো!

বিষণ্ণ ঝমরু আকাশের দিকে চাইল। যেন আকাশে কাকে খুঁজছে। একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল ঝমরুর বিষণ্ণ অধরে।

'তোরই তো পুজো হল রে কুট্টি, তুই কি বুঝেছিলি?'

সবাই তো তাই বলল।

পুরুতমশাই আবার এককাঠি ওপরে। বলে কী!

'ও চাইছে বলি হতে।'

একটা বাজে গালাগাল মনে এলো ঝমরুর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সংযত হল। আবার যদি পুজো করতে হয়!

কেন-যে সেদিন হরিশখুড়োর কথা শোনেনি ঝমরু। আজ দু'-হাতে চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ আর কান্নাকে থামিয়ে রাখছে ঝমরু।

পনেরো দিন আগে থেকে কুচকুচে কলো, আলো-আলো গা, নধরকান্তি, পুরুষ্টু ছাগল খুঁজে বেড়াচ্ছে ঝমরু। এমন ছাগল কি আর-একটাও জন্মায়নি? আশপাশের সব গাঁয়ে গেছে। কোথাও অমন ছাগল নেই।

যজ্ঞ তো করতেই হবে। বছরে নাকি একবারই মাত্র এমন দিন আসে! কী-এমন বিশেষ দিন—পুরুতেই জানে! অমন নিকষ কালো অমাবস্যে তো কতবার এলো গেল—এ-দিনটা কেন আলাদা, কে-জানে বাপু!

ছুট্‌কী ধরে বসল, 'এখনই পুজো হবে। যেখান থেকে পারো, ছাগল এনে দাও।'

'নে, হয়েছে তো? পুজোর সাধ মিটেছে তো? কুট্টিকে খেয়ে এবার বাকি সাধটা মেটা।'

ছুট্‌কীর দিকে ফিরল ঝমরু।

এখনও একইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছুট্‌কী। হলটা কী ওর? দুঃখ হচ্ছে এখন? হুঁঃ।

কুট্টিও যেমন! সকাল থেকে পুজোঘরে ঘুর-ঘুর ঘুর-ঘুর। ভিজে চাল, কলা, ফল—লোভটা সামলায়ই-বা কী করে বেচারা! আবার হাঁড়িকাঠটার দিকে কেমন অবাক হয়ে চেয়েছিল।

তাই দেখেই-না পিতম চাটুজ্যে বললেন, 'কী-রে ব্যাটা, চড়বি নাকি? সাধ একেবারে মিটে যাবে।'

পাশের বাড়ির ক্ষেমতি অমনি বলল, 'তা-যা বলেছ খুড়ো। অমনি কুচকুচে কালো, নধরপানাই তো খুঁজে মরছে।'

পুরুতের চ্যালা নেতাইটা কোথা থেকে উড়ে এসে 'এই তো! এতেই চলে যাবে! বাড়িতে থাকতে সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে?' বলেই কুট্টির পিঠে একটা জোরে চাপড়।

বেচারা 'ম্যা' করে কেঁদে উঠেছিল। বিম্‌লিও ওদিক থেকে সাড়া দিল।

পটলা বলে উঠল, 'অ্যাই নিতাইদা! জানো না, ঝুমরুদাদার কত আদরের ছাগলছানা? কী হচ্ছে কী?'

ছুট্‌কী কি পাগল হয়ে গিয়েছিল? হঠাৎ বলে বসল, 'না-না, আদরটাদর জানিনে বাপু, না-পেলে ওটাকেই...' বলতে বলতে ঝমরুর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। তারপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে 'যাই—ওদিকে আবার ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে।' বলতে বলতে হাঁটা দিল।

হতভম্ব ঝমরু চেয়ে রইল ভার বুকে। বিস্ময় আর কান্নায় গলা বুজে এলো। না-হয় মা হোসনি, তাই বলে কি প্রাণে এতটুকুও দয়ামায়া নেই রে? না-হয় নিজে হাতে ওর ময়লা পরিষ্কার করিসনি। কিন্তু ওর পিঠে হাত তো বুলিয়েছিস! বলেছিস, 'দ্যাখো-দ্যাখো, কী নরম গা-খান... ঠিক যেন মখমল!'

একটু আগে কথাগুলো বলার সময় একবারও কি মনে পড়ল না? পারবি তুই, তোর না-হওয়া ছেলের জন্য ওর মায়ের কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিতে? হায় রে ছুট্‌কী, তাতে কি তোর ছেলের ভালো হবে?'

স্তম্ভিত ঝমরু দেখল কুট্টিকে চান করানো হল। মালা, তিলক, সিঁদুর, রক্তচন্দন পরানো হল।

গা-বমি করছিল ঝমরুর। চোখের জল শুকিয়ে দামোদরের পলি। এমন কেন হচ্ছে—বুঝে উঠতে পারছিল না যেন!

শেষে হাঁড়িকাঠে মাথাটা রাখতেই ছুটে এসেছিল ঝমরু, 'না না না। এ হতে পারে না! কুট্টি রে, বিম্‌লিকে আমি কী জবাব দেব?'

হাহাকার করে উঠল ঝমরু। চোখের সামনে অন্ধকার!

শুনল পুরুতের গর্জন, 'বলির পাঁঠা সরিয়ে নিলে, দেবীর কোপে পড়বি। নির্বংশ হবি।'

তাতে আপত্তি নেই ঝমরুর, তবু তো কুট্টি বাঁচবে। কিন্তু কে-যেন টেনে নিয়ে গেল। একটা তীব্র আর্তনাদও যেন কানে গেল। কুট্টির গলা কি? বেআক্কেলে ঢাকিগুলো এত জোরে বাজাতে শুরু করল, শেষ ডাকটা শোনাও হল না ঝমরুর।

তারপর সব অন্ধকার।

কতক্ষণ কে-জানে! মুখে-চোখে বৃষ্টির ছাঁট পড়তেই, চোখ মেলল ঝমরু। বৃষ্টি নয়, জল। উৎসুক একদল মুখ ঝমরুর দিকে চেয়ে আছে। খুব কাছে ছুট্‌কীর মুখ।

'আমার দোষ নিয়ো না গো। আমি জানতাম না কুট্টি তোমার এতখানি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঝমরু। কুট্টি তাহলে সত্যিই নেই! মুখ ঘোরাল। চোখের পাশ দিয়ে গরমজলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

কবে-আর জানতে চাইলি ছুট্‌কী, বুঝতে চাইলি আমাকে? মনে মনে বলল ঝমরু।

'মুখ ঘোরাবে না? কথা কইবে না আমার সঙ্গে?'

ব্যথিত, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ঝমরু, ছুট্‌কীর দিকে।

পুরুত বলে উঠলেন, 'হয়েছে হয়েছে। এবার নাও দিকি। বাকি কাজটা সেরে নিয়ে ছুটি দাও আমায়।'

ঝমরুকে ধরে ধরে উঠে বসালেন হরিশখুড়ো। ধরেই রইলেন। ঝমরুর দু'-চোখ বোজা। কুট্টির প্রাণহীন দেহটা দেখবে না ঝমরু।

বিম্‌লি ডেকেই চলেছে।

মায়ের প্রাণ, নাড়ি-ছেঁড়া ধন, তার বিপদ টের পাবে না? হায় রে বিম্‌লি, যদি জানতিস আমরাই তোর সবচেয়ে বড় শত্তুর!

দম বন্ধ হয়ে আসে ঝমরুর। জিভ শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁট ভেজাবার মতো জলও যেন ওর দেহে নেই। নিস্তেজ, শূন্য দৃষ্টি।

'নাও, এবার ধরো।'

পুরুতের কথা ভেসে এলো, যেন দূর থেকে।

কী ধরবে? কেন ধরবে? কিছুই বোঝার ক্ষমতা নেই।

কুট্টির দেহটা হাতে তুলে দিতেই সম্বিত ফিরল ঝমরুর। ছুট্‌কীও হাত রাখল কুট্টির গায়ে। কী-সব মন্ত্র আওড়াতে হল।

কী-যে মন্ত্র! মানেও জানে না, শোনেওনি কস্মিনকালে। মানে না-বুঝে দেবতার কাছে কী চাইল, কে জানে! দাঁত দিয়ে ঠোঁটটাকে চেপে ধরল ঝমরু। ছুট্‌কীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। ওর জন্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটল!

হঠাৎ সব কিছু শান্ত। ঝমরু বুঝতে পারছে না কী হল।

সবার চোখ দরজার দিকে। ছুট্‌কীর চোখ বিস্ফারিত।

ঝমরু ক্লান্তভাবে চাইল দরজার দিকে।

বিম্‌লি! দড়িটা বোধহয় আলগা ছিল। চলে এসেছে। দু'-চোখে মিনতি। কুট্টিকে খুঁজছে।

সবাইকে চমকে দিয়ে বিম্‌লির পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ছুট্‌কী। বন্ধ করল শোবার ঘরের দরজা। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঝমরু। অনেকক্ষণ কাঁদবে ছুট্‌কী— নিজের ভুলের জন্য, ঝমরুকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, বিম্‌লির বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নেওয়ার জন্য।

ঝমরু বেরিয়ে এলো। বিম্‌লিকে বেঁধে রেখে এলো বাঁশের খোঁটায়। শক্ত করে।

ফিরে এসে পুরুতকে বলল, 'যাও গো ঠাকুর, এবার কুট্টিকে নিয়ে, চাল-কলা নিয়ে বাড়ি যাও। এ-বাড়িতে পাপের বোঝা আর বাড়িও না।'

কে-একজন বলল, 'খাওয়াটা?'

স্থির, শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝমরু বলল, 'যাও, এ-বাড়িতে ফল-প্রসাদ খেয়ে, ঠাকুরের বাড়ি গিয়ে ঝোল-ভাত খাও।'

নামাঙ্কন : সমীর দাশ

অলঙ্করণ : পার্থসারথি ভট্টাচার্য

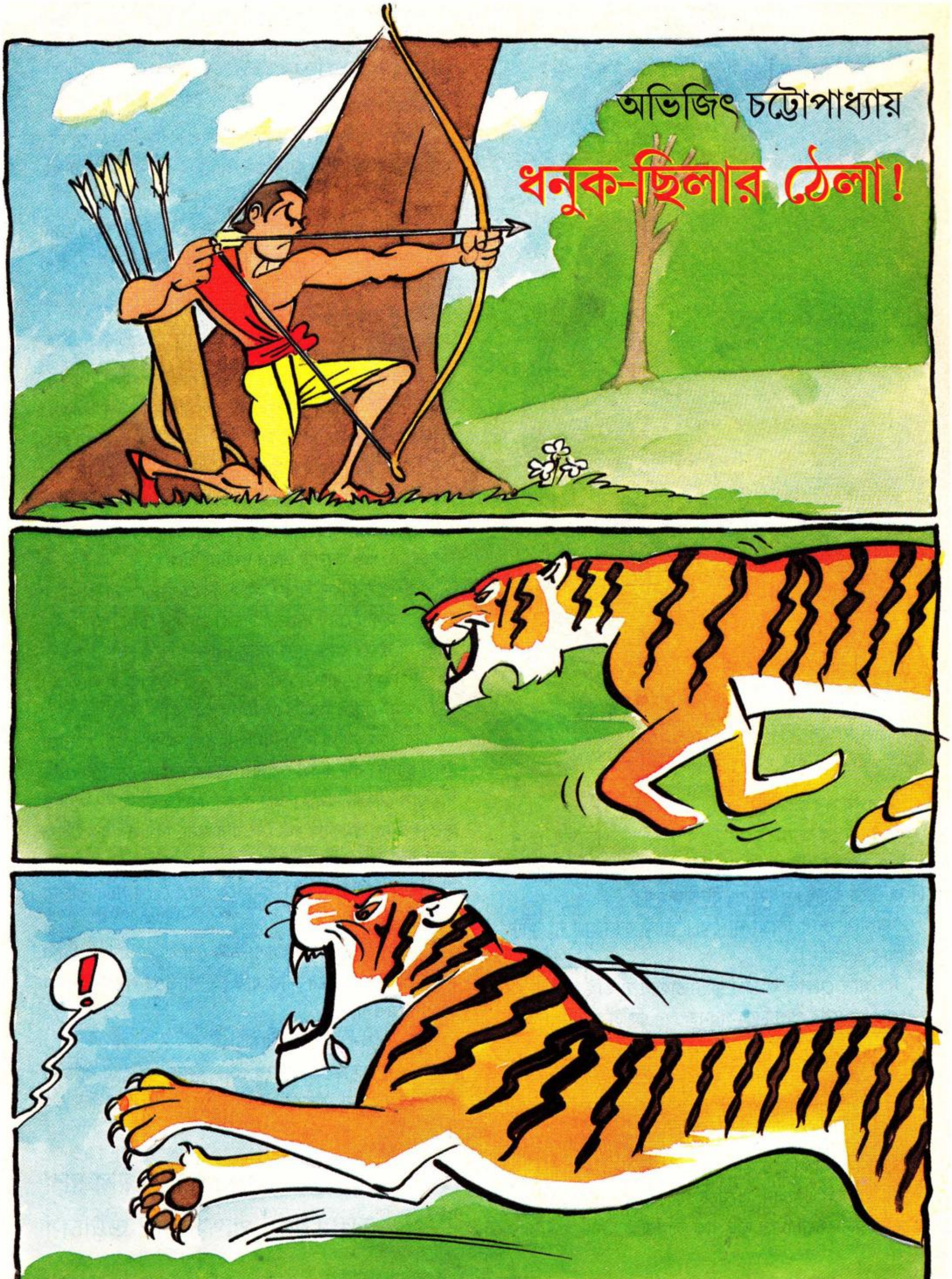
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ধনুক-ছিলার ঠেলা!
!

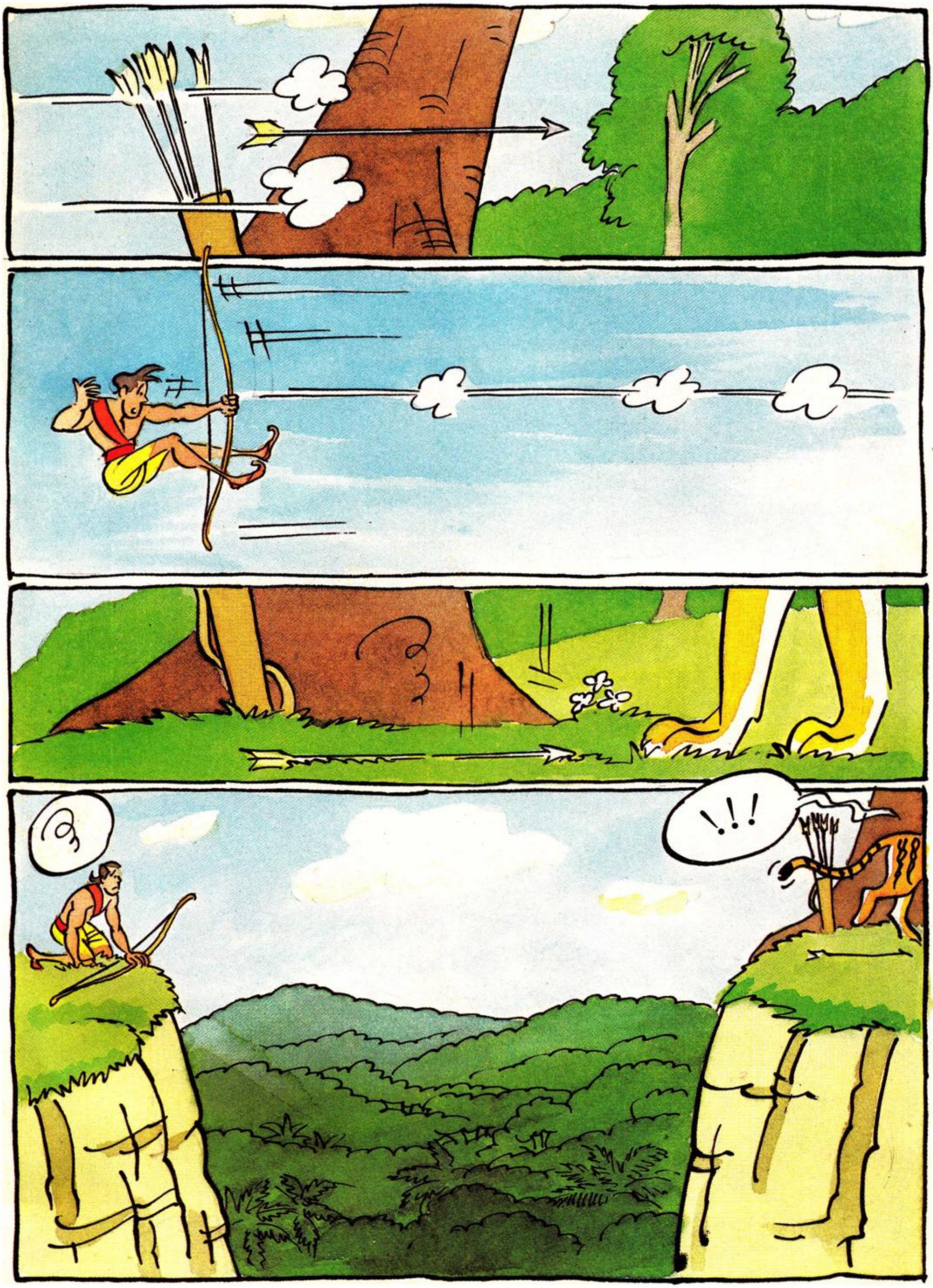

মৃদুল দাশগুপ্ত

একদিন স্কুলে

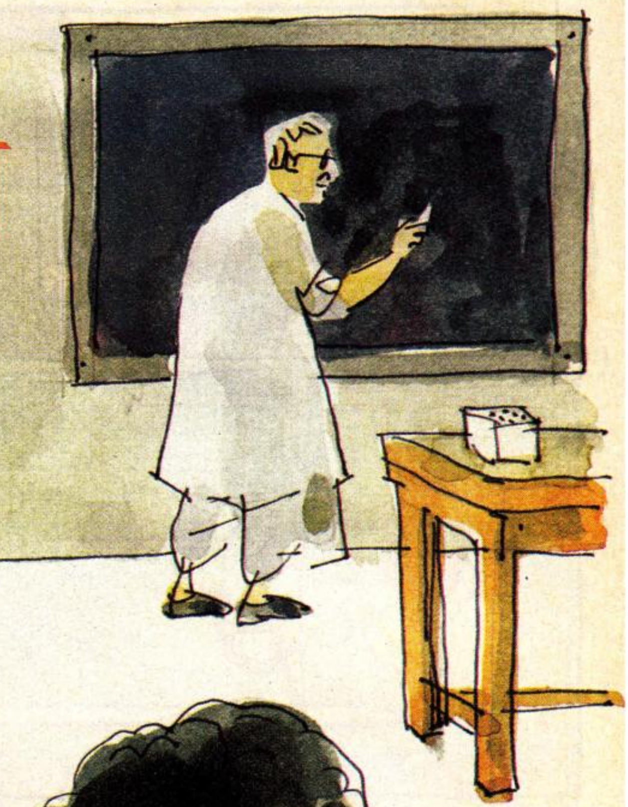

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

একদিন ভোরে উঠে তেল দিয়ে চুলে
চান সেরে খেয়েদেয়ে যাবো ইস্কুলে।
এসেছেন হেডস্যার সমান বয়সি
সাধ হয় স্কুলে গিয়ে তাঁর কাছে বসি।
নতমুখ করজোড়ে অনুনয় ক'রে
বলব, 'আমাকে স্যার নিয়ে নিন ফোর-এ।'

যদি নেন, সে তো হবে হাতে চাঁদ পাওয়া
অফিস দেখবে আমি হয়ে গেছি হাওয়া!
আমি তো তখন এক দামাল বালক
লুকিয়ে ভূগোল-ক্লাসে পড়ছি 'নালক'।

R N I No 12007/64
SANDESH • MARCH 2006 a bengali monthly for young readers Rs 10.00

Arambagh Hatcheries Ltd.

The only fully integrated poultry organisation in India.

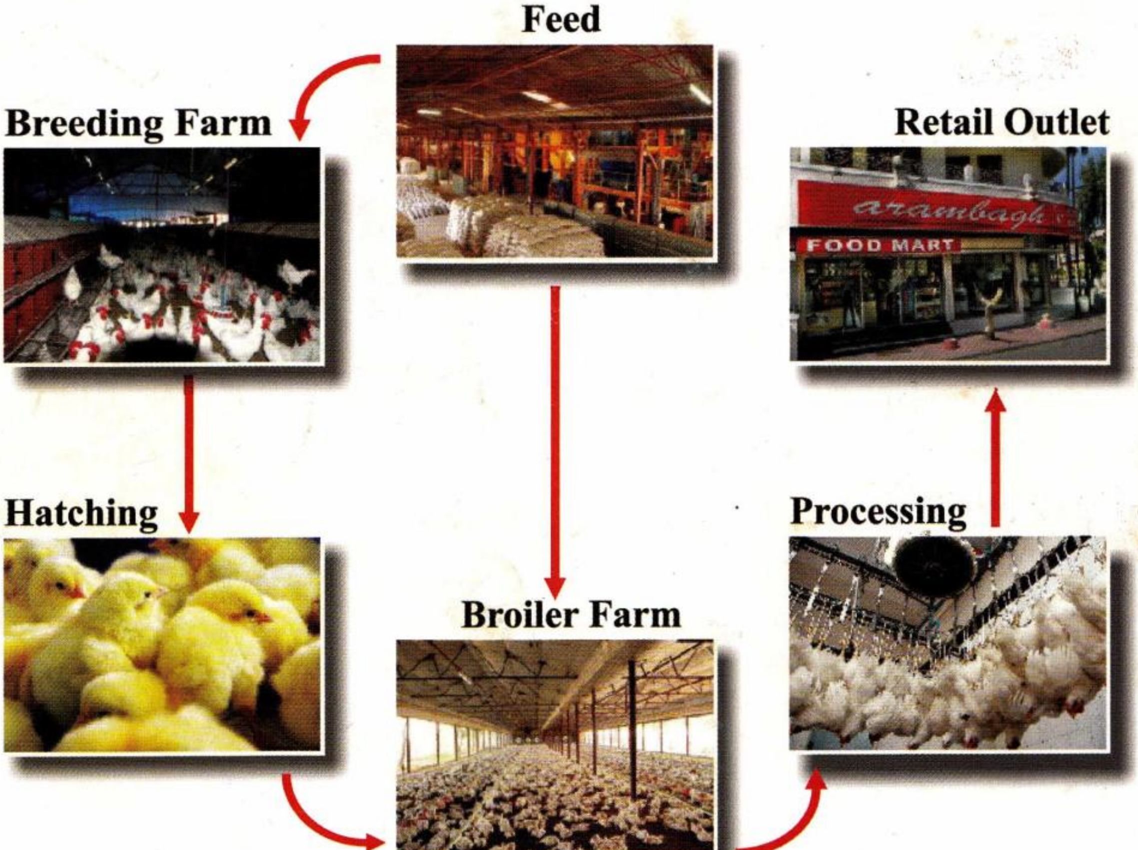

There is full traceability of its branded Chicken products right through the supply chain

SQF stands for- Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

HELP LINE
22832603 • 22832588 • 22814116

arambagh's chicken